ইসকনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
অমৃতের সন্ধানে

শ্রীল প্রভুপাদ বারবার উল্লেখ করেছিলেন যে, ইস্‌কনের নেতারা যেন তাঁর সরাসরি পরিচালনা ব্যতীতই সমস্ত কাজ সম্পাদন করতে শুরু করে। একদিন নিউইয়র্ক শহরে তাঁর প্রথম বছরের একটি ঘটনার কথা বলতে গিয়ে, হঠাৎ তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন, “এটি নষ্ট করো না। এখন সব কিছু নির্ভর করছে তোমাদের মতো নেতৃস্থানীয় ভক্তদের উপর। আমি তোমাদের থেকে চলে যেতে পারি। আমার স্বাস্থ্য ভাল নয়। আমি বৃদ্ধ আর তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এখন তোমরা জি.বি.সি-রা, ভক্তরা সুদক্ষভাবে এই আন্দোলন পরিচালনা কর। এই আন্দোলন এগিয়ে চলুক। তোমাদের অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা রয়েছে। সুতরাং সেই জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না। আর আমাকে যদি চলে যেতে হয়, তাতে ক্ষতি কি? আমি আমার ধারণা ও নির্দেশ গ্রন্থগুলির মধ্যে রেখে গেছি। তোমাদের কেবল সেগুলি দেখে নিতে হবে। আমার মনে হয় আমার কর্তব্য আমি সম্পাদন করেছি। তাই নয় কি? তোমরা কি তাই মনে কর না?
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)-এর
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

চর্তুদশ বর্ষ ◗ দ্বিতীয় সংখ্যা ◗ এপ্রিল ◗ মে ◗ জুন ২০০৯ ইং

প্রতিষ্ঠাতা ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে, বাংলাদেশ ইস্‌কন গভর্নিংবডি কমিশনার ও গুরুবর্গের কৃপায়

সম্পাদক	ঃ	**শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী**
সহকারী সম্পাদক	ঃ	শ্রী সুখী সুশীল দাস ব্রহ্মচারী
		শ্রী দ্বিজেশ্বর গৌর দাস ব্রহ্মচারী
উপদেষ্টা মন্ডলী	ঃ	শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ দাস
		শ্রী সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, [illegible]
পৃষ্ঠপোষকতায়	ঃ	শ্রী চিত্ত রঞ্জন পাল
		শ্রী অনিল ঘোষ
আনুকূল্য	ঃ	**প্রতিকপি-২০.০০ টাকা**
		এবং বাৎসরিক গ্রাহক আনুকূল্য
		রেজিঃ ডাকে – ১২০.০০টাকা
কম্পিউটার গ্রাফিক ডিজাইন	ঃ	প্রসেনজিৎ রাজবংশী ভক্ত

বিঃদ্রঃ বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। অমৃতের সন্ধানে	১
২। বৈষ্ণব পঞ্জিকা	২
৩। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রত্যেকেরই অন্তরে	৩
৪। শ্রীগৌর-ভজন	৫
৫। শ্রীনাম	৭
৬। রামরাজত্ব	৯
৭। কলিযুগে প্রেমভক্তির অস্ত্রশস্ত্রাদি	১২
৮। কলিযুগের ভণ্ড অবতার	১৩
৯। আমি কেন এই জড় জগতে এসেছি	১৪
১০। মানুষকে যথার্থ বৃত্তিযুক্ত নেতার কর্তব্য	১৬
১১। তারুন্য কৃষ্ণভাবনামৃতের গুরুত্ব	১৮
১২। জাত গোস্বামী/গোঁসাই সম্প্রদায়	২০
১৩। আমি কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হলাম	২২
১৪। যত নগরাদিগ্রাম	২৩
১৫। বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে	২৪
১৬। শ্রীমদ্ভাগবত	২৬
১৭। আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভের উপায়	৩০
১৮। উপাখ্যান উপদেশ	৩১
১৯। ছোটদের দশ অবতার	৩২
২০। আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর	৩৬
২১। সম্পাদকীয়	৪০

❊ প্রচ্ছদপট ❊

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

"যাঁর মুখে সর্বদা কৃষ্ণ নাম, যাঁর অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে কলিযুগের সুবুদ্ধিমান মানুষেরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করেন।"

বৈষ্ণব পঞ্জিকা

গৌরাব্দ- ৫২৩, বঙ্গাব্দ- ১৪১৪-১৫১৫, খ্রিষ্টাব্দ- ২০০৯

১৯ বিষ্ণু, ৩১ মার্চ ২০০৯, মঙ্গলবার	ঃ	শ্রী রামানুচার্যের আর্বিভাব
২২ বিষ্ণু, ৩ এপ্রিল শুক্রবার	ঃ	শ্রী রামনবমী, ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের আবির্ভাব সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস
২৪ বিষ্ণু, ৫ এপ্রিল রবিবার	ঃ	**শুদ্ধ একাদশী, কামদা একাদশীর উপবাস শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের আবির্ভাব**
২৫ বিষ্ণু, ৬ এপ্রিল সোমবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৭.৩২ মিঃ থেকে ৯.৫৬ মিঃ মধ্যে।**
২৮ বিষ্ণু, ৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার	ঃ	পূর্ণিমা, শ্রী বলরামের রাস যাত্রা, শ্রীকৃষ্ণ বসন্তরাস
৫ মধুসূদন, ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার	ঃ	পঞ্চমী, শালগ্রাম তুলসীতে জল দান শুরু
১২ মধুসূদন, ২১ এপ্রিল মঙ্গলবার	ঃ	শুদ্ধ একাদশী, রুথিনী একাদশীর উপবাস
১৩ মধুসূদন, ২২ এপ্রিল বুধবার	ঃ	একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.৩২ মিঃ থেকে ৯.৪৮ মিঃ মধ্যে।
১৬ মধুসূদন, ২৫ এপ্রিল শনিবার	ঃ	শ্রীগদাধর পন্ডিতের আর্বিভাব
১৮ মধুসূদন, ২৭ এপ্রিল সোমবার	ঃ	২১দিনের জন্য চন্দন যাত্রাশুরু
২৪ মধুসূদন, ৩ মে রবিবার	ঃ	ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র পত্নী শ্রীমতি সীতা দেবীর আবির্ভাব
২৬ মধুসূদন, ৫ মে মঙ্গলবার	ঃ	**মোহিনী একাদশীর উপবাস**
২৭ মধুসূদন, ৬ মে বুধবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.২১ মিঃ থেকে ৯.৩৫ মিঃ মধ্যে।**
২৯ মধুসূদন, ৮ মে শুক্রবার	ঃ	শ্রী নৃসিংহ চর্তুদশী উপবাস
৩০ মধুসূদন, ৯ মে শনিবার	ঃ	শ্রী নৃসিংহ চর্তুদশী পারণ, শ্রীকৃষ্ণের ফুল দোল
৫ ত্রিবিক্রম, ১৪ মে বৃহস্পতিবার	ঃ	শালগ্রাম, তুলসী জলদান সমাপ্ত
১১ ত্রিবিক্রম, ২০ মে বুধবার	ঃ	**শুদ্ধ একাদশী, অপরা একাদশীর উপবাস**
১২ ত্রিবিক্রম, ২১ মে বৃহস্পতিবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৯.০০ মিঃ থেকে ৯.৪১ মিঃ মধ্যে।**
২৪ ত্রিবিক্রম, ২ জুন বৃহস্পতিবার	ঃ	গঙ্গাপূজা
২৫ ত্রিবিক্রম, ৩ জুন বুধবার	ঃ	**শুদ্ধ একাদশী, পান্ডবা নির্জলা একাদশীর উপবাস**
২৬ ত্রিবিক্রম, ৪ জুন বৃহস্পতিবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.১১ মিঃ থেকে ৯.৪১ মিঃ মধ্যে**
২৯ ত্রিবিক্রম, ৭ জুন রবিবার	ঃ	শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব
১১ বামন, ১৮ জুন বৃহস্পতিবার	ঃ	শ্রীবাস পন্ডিতের তিরোভাব
১২ বামন, ১৯ জুন শুক্রবার	ঃ	**শুদ্ধ একাদশী, যোগিনী একাদশীর উপবাস**
১৩ বামন, ২০ জুন শনিবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.১২ মিঃ থেকে ৯.৪৪ মিঃ মধ্যে**
১৫ বামন, ২২ জুন সোমবার	ঃ	শ্রীগদাধর পন্ডিত ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)
১৬ বামন, ২৩ জুন মঙ্গলবার	ঃ	শ্রী গুন্ডিচা মার্জন
১৭ বামন, ২৪ জুন বুধবার	ঃ	**শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব- ২০০৯**
২১ বামন, ২৮ জুন রবিবার	ঃ	হিরাপঞ্চমী
২৫ বামন, ২ জুলাই বৃহস্পতিবার	ঃ	**শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের উল্টোরথযাত্রা উৎসব- ২০০৯**
২৬ বামন, ৩ জুলাই শুক্রবার	ঃ	**শুদ্ধ একাদশী, শয়ন একাদশীর উপবাস**
২৭ বামন, ৪ জুলাই শনিবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.১৬ মিঃ থেকে ০৮.৩৭ মিঃ মধ্যে**

কৃষ্ণভাবনামৃত প্রত্যেকেরই অন্তরে রয়েছে

– শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

১১ নভেম্বর ১৯৭৩ দিল্লীতে প্রদত্ত ভাগবত (১/২/৫-৬) প্রবচন থেকে সংকলিত

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে । তাতে আমার কী লাভ? ধরুন, ভগবানকে আমি শুধুই ভালবাসি। ভালবাসি। ভালবাসবার প্রবৃত্তি আমার মধ্যে রয়েছে। কোন ছেলেকে ভালবাসি। কোন মেয়েকে ভালবাসি। আমার দেশকে ভালবাসি। পরিবার পরিজনকে ভালবাসি। আমার সমাজকে ভালবাসি। ভালবাসার প্রবৃত্তি রয়েছেই। তাতে কোনই সন্দেহ নেই। প্রত্যেকেরই, সে কুকুর বেড়াল হলেও, জীব মাত্রেরই ভালবাসবার প্রবৃত্তি রয়েছে। বাঘও তার বাচ্চাটিকে ভালবাসে।

কিন্তু এই ভালবাসা, যখন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হবে, তখনই হবে জীবনের সার্থকতা। স বৈ পুংসাং পরোধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। কেমন ধরনের ভালবাসা? অহৈতুকী। ভগবানকে ভালবাসার অন্য কোনও কারণ থাকা চলবে না যে, "ভগবান আমাকে কিছু ধনসম্পত্তি দেবেন, ভগবান আমাকে এটা দেবেন, সেটা দেবেন...... ভগবানের কাছ থেকে এটা চেয়ে নেব।" না। অহৈতুকী, কোনও হেতু নয় যে, "আমি কিছু টাকা পয়সা চাই, তাই মন্দিরে কিংবা গির্জায় যাব, কিংবা তাই আমি ভগবানকে ভালবাসব।" না অহৈতুকী। যেমন অনেকে সাধারণত ওসব জায়গায় যায় যে, "হে ভগবান, আমাদের রোজকার রুটি এনে দাও।"

বেশ তো, ভগবানের কাছে গিয়ে রুটি চাওয়া কেন? রুটি তো প্রতিদিনের জন্যেই সকলকে দেওয়া রয়েছে, এমন কি পাখি আর পোকা-মাকড়দের জন্যেও। রুটি, খাদ্য তো রয়েছেই। কিন্তু লোকে জানে না যে, "আমার রুটি, আমার খাদ্য এখানে রয়েছেই। তো রুটির জন্যে ভগবানকে নিয়ে জ্বালাতন করব কেন? বরং ভগবানকে ভালবাসতে শেখা যাক।"

ভগবান তো আমাদের কত কিছু জিনিস দিচ্ছেন না চাইতেই। ভগবান আমাদের আলো দিচ্ছেন, ভগবান আমাদের জল দিচ্ছেন, ভগবান .... ভূমিরাপোহনলোবায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিঃ..... যা যা না হলে আপনারা বাঁচতেই পারেন না, সেই সব কিছুই তিনি তো দিচ্ছেন। আর তিনি আমাদের রুটি দেবেন না?

অবশ্য ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, যারা ধর্মপ্রাণ, তারাও কিছু জাগতিক লাভের আশায় ভগবানের কাছে যায় কিছু চাইতে। চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন। সুকৃতিন মানে যারা ধর্মপ্রাণ।

তার ঠিক বিপরীত হল দুস্কৃতি। তারা কখনোই ভগবানের কাছে যায় না। যেমন কম্যুনিস্টরা। ওরা বলবে, "কী আছে এই মাথামুণ্ডু ভগবানের? আমরাই আমাদের খাদ্য উৎপাদন করে নেব। আমাদের সুখ-শান্তি

গড়ে নেব।" ওদের বলা হয় দুস্কৃতি। দুস্কৃতি মানে পাপীতাপী। আসলে, তারা তো জানে না যে, ভগবানের অনুমতি ছাড়া আপনারা কেউ কিছুই পেতে পারেন না।

তাই শেষ পর্যন্ত, ভগবানের এই ক্ষমতা যে স্বীকার করে নেয় এবং ভগবানের কাছে রুটি বা অন্য কিছু, টাকাকড়ি বা অন্য কিছু চাইতে যায়, তারা ধর্মপ্রাণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তার বর্ণনা রয়েছে। সুকৃতিনোহর্জুন। কিন্তু যারা মোটেই ভগবানের কাছে যায় না, ভগবানকে গ্রাহ্য করে না, তাদের বলা হয় দুস্কৃতিনো। ন মাং দুস্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমঃ।

তাই ভগবানকে ভালবাসাই হল চরম.....শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বলেছেন, প্রেমা পুমার্থো মহান্–"পরম পুরুষোত্তম ভগবানে প্রেমময়ী সেবার স্তরে উপনীত হওয়া যায় কিভাবে, সেই অনুশীলনের মাধ্যমেই জীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ অর্জন করা যায়।" তাতেই যথার্থ সার্থকতা এখানে তারই বর্ণনা রয়েছে। অহৈতুক্যাপ্রতিহতা। অপ্রতিহতা হচ্ছে, এই ভগবৎ প্রেম প্রতিহত করা যায় না। যদি কাউকে এই জড় জগতে আপনি ভালবাসেন তখন আপনার যদি টাকা পয়সা না থাকে, তা হলে ভালবাসার লেনদেন বিঘ্নিত হবে।

কিন্তু এই যে ভগবানকে ভালবাসা, এর কোনও বিঘ্ন হবে না। ভগবানকে যদি ভালবাসতে চান, কোনও

জড়জাগতিক প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না। অহৈতুক্যপ্রতিহতা। একে প্রতিহত করা যায় না, বিঘ্নিত করা চলে না, ব্যাহত হয় না কিছুতেই। আপনি গরিবী সমাজে সব চেয়ে গরিবজনের চেয়েও গরিব হতে পারেন, তবু আপনি ভগবানকে নির্বিঘ্নেই ভালবাসতে পারবেন।

সেই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদগীতায় বলেছেন, পুত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। পত্রম্, একটি ছোট্ট পাতা বা একটুখানি জল কিংবা ছোট্ট ফুল বা ছোট্ট ফল। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং।

যদি আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রণতি নিবেদন করে বলেন, "হে ভগবান, হে শ্রীকৃষ্ণ, আমি বড় গরিব। আমি আপনাকে কিছুই দিতে পারছি না। তবে আমি একটি ছোট ফল, ছোট ফুল আর একটু জল এনেছি। তাই আমি আপনাকে নিবেদন করতে এসেছি।"– তাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "হ্যাঁ", তদহম্ অশ্নামি, তদহম্ ভক্ত্যাপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ। তাঁর ক্ষুধা নেই, কিন্তু তিনি আপনার ভালবাসা পেতে চান। আপনার কাছে থেকে প্রেম নিবেদন চান তিনি। তাই তিনি আসেন, স্বয়ং তিনি অবতীর্ণ হন। যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানিঃ।

ধর্মস্য গ্লানিঃ বলতে কি বোঝায়? লোকে যখন ভুলে যায় কিভাবে ভগবানকে ভালবাসতে হয়, সেটাই হল ধর্মস্য গ্লানিঃ, তাই না? অন্য কিছু নয়। তাই তিনি আবির্ভূত হন এবং অবশেষে তিনি শিক্ষা প্রদান করেন।.........

এর মাধ্যমেই তিনি আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন যে, মন্মানাভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজি মাং নমস্কুরু। এই হল ভগবানের শিক্ষা যে, "তুমি কেবল ভগবানের কথা চিন্তা করতে থাক।" মন্মানা ভব মদ্ভক্তো মাং নমস্কুরু।

আপনারা যে এখানে আসছেন। এখানে ভগবান রয়েছেন। আপনারা প্রণতি নিম্নে করছেন, এটাই আপনাদের লাভ হবে। হ্যাঁ। একে বলে অজ্ঞাত সুকৃতি। যাঁরা এখানে এই মন্দিরে আসছেন, আরতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন, ভগবানের প্রীতিবিধানে নৃত্যকীর্তন করছেন, কিংবা কিছু নিবেদন করছেন শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে। সেই সমস্তই আপনাদের লাভের খাতে জমা হয়ে যাচ্ছে। সব কিছু আপনাদের লাভের হিসাবে জমবে। এইভাবে.....ঠিক যেমন করে আপনারা ব্যাংকে টাকা জমিয়ে তোলেন, এক টাকা, এক টাকা, এক টাকা করে, এক সময়ে আপনি দেখবেন–"এই তো ১,০০,০০০ টাকা এখন হয়ে গেছে।"

ঠিক তেমনি, আমরা সারা পৃথিবীতে এইভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির খুলে মানুষকে সুযোগ করে দিচ্ছি যাতে ভগবানের মহিমা কীর্তন করবার সুযোগ সকলে পেতে পারে। তার মানে এই সব কাজের মাধ্যমে তাদের জমার হিসাব বেড়ে চলেছে। সকলে যদি অনতিবিলম্বে এই সুযোগটি গ্রহণ করে, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, তা হলে খুবই ভাল।

তবে কেউ যদি তা না পারে, তো এই সুযোগ কখনই বৃথা বয়ে যাবে না। এই হল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন। স বৈ পুংসাং পরোধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে, অহৈতুকী। আর এতে যে কেউই যোগ দিতে পারে। কোনও প্রশ্ন নেই। শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের কিংবা ভারতবাসীদের নন। এটা ভুল কথা। এখন, পাশ্চাত্যবাসীরা, ইউরোপবাসীরা, আমেরিকানরা তারা বুঝতে পারছে। তবে অনেকে জানে না, তাই বলে, "আমরা কেন শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করব? তিনি তো ভারতবাসী। তিনি তো হিন্দু।"

না, শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই। ঠিক সূর্যের মতো। একই সূর্য উঠছে, প্রথমে উঠছে ভারতে, তারপর ক্রমে যাচ্ছে ইউরোপে। তার মানে হল কী যে, ইউরোপীয়ান সূর্য আর ভারতীয় সূর্য আলাদা? না, একই সূর্য।

তেমনি, ভগবানও এক, সকলেরই জন্য। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতায় বলেছেন, সর্বযোনিষু কৌন্তেয়। সর্বযোনিষু মানে হল ৮৪ লক্ষ প্রজাতির জীব। সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ। (গীতা ১৪/৪) সমস্ত প্রজাতির মধ্যে বহু শরীর নিয়ে জীবের জন্ম হয়ে থাকে। তাসাং ব্রহ্ম মহদ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা। তিনি বলেছেন, "আমিই বীজপ্রদানকারী পিতা।" মামৈবাংশো জীবভূতাঃ। "প্রত্যেক জীবই আমার অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, পুত্র কন্যারূপে তারা পরম পিতার অংশ।" তাই কয়েকটি ধর্মমতেও ভগবানকে পরম পিতা বলা হয়ে থাকে। বাস্তবিকই, তিনি হলেন পরম পিতা।

তাই আমাদের পিতার সম্পত্তি সম্পদ ভোগ করা যেমন আমাদের কর্তব্য, তেমনই পরম পিতাকে ভালবাসাও আমাদের কর্তব্য। সেটাই হল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন। আর তাকে প্রতিহত করা যাবে না। অহৈতুকী অপ্রতিহতা। যয়াত্মা সুপ্রসীদতি। প্রত্যেকেই মনের শান্তি চায়। আত্মা। আত্মা মানে শরীর, আত্মা মানে মন, আত্মা মানে অন্তঃ প্রকৃতি। যয়াত্মা সুপ্রসীদতি। সুপ্রসীদতি মানে প্রসন্ন হওয়া। আর সু মানে খুবই।

অতএব ভগবানকে ভালবাসবার এই কৌশল যদি আপনারা না শেখেন, তবে সুখী হতে পারবেন না। এটাই আসল কথা। এটা যদি করতে চান, আগেভাগেই তা সেরে ফেলুন।.... কিভাবে শিখবেন? এখন এটাই হল সুযোগ এই মানবরূপী জনমে। এখনই শিখে নিতে পারবেন। আর এটা সহজ সাধ্য.....পদ্ধতিটি খুবই সাদাসিধে, বিশেষত এই যুগে। সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে–

কালের্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকো মহান গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

(বাকী অংশ ১১পৃষ্ঠায়)

শ্রী গৌর- ভজন

- জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদ

গৌর-ভজন করিতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত একটু পরিচয় করিতে হয়। 'ভজন' শব্দে সেবাকেই লক্ষ্য করে। সেব্য বস্তুর পরিচয়ের অভাবে অপর বস্তুর সেবা হইয়া পড়ে; সে জন্যই বেদ, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি বিষয়ের আবাহন করিয়াছেন।

বস্তু-বিষয়কে অভিজ্ঞানই সেই বস্তুর সহিত জ্ঞাতার সম্বন্ধ। ভক্তের ভজনে ভগবানই সম্বন্ধ। ভগবান, ভজন ও ভক্ত সম্বন্ধ জ্ঞানরহিত হইয়া অবস্থান করেন না। যেখানে সম্বন্ধ ভগবান নহেন, তথায় ভক্ত ও ভক্তি নাই। ভোগময় বিচার তর্কের আবাহন করে। যেখানে ভক্তের ইন্দ্রিয় অনিত্য জড় নশ্বর ভোগে ব্যস্ত, তথায় সচ্চিদানন্দ -বিগ্রহ গৌরসুন্দরের স্বরূপ বদ্ধজীবের নেত্রে অদৃশ্য। বদ্ধজীবের ভোগের অন্যতম নশ্বর বস্তু-প্রতীতি গৌরসুন্দরে সংবদ্ধ হইলে গৌরাঙ্গকে ভোগজ্ঞান করা হয়- ইহা ভজনের নিতান্ত বিরোধী। ভজনের নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা নশ্বর ভোগময়ী ধারণামাত্র শোভনীয় নহে।

গৌরভক্ত বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করিয়া যাঁহারা নিজেন্দ্রিয় তর্পণমাত্র সার জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গকে ভজনীয় বস্তু জানিবার প্রতিকুলে নিজ নশ্বর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শও শব্দ-গঠিত গৌর কল্পনা করেন মাত্র, তাহাতে শ্রীগৌরভজন হওয়া দুরে থাকুক, অনর্থময় বিষয়গ্রহণ মাত্র হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত, বলিয়াছেন, ভগবদস্তু অধোক্ষজ।

অধোক্ষজ শব্দে ইহাই বুঝায় যে, যিনি জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত বস্তু অর্থাৎ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগের বস্তুমাত্র নহেন। শ্রীজীব-গোস্বামীপাদ সন্দর্ভের কয়েকস্থানেই বলিয়াছেন, 'অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ'। যেখানে 'অধোক্ষজ' শব্দে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষিত হন, তথায় গৌরসুন্দর আমাদের ভোগ্যবস্তু নহেন। অপর ভাষায় বলিতে গেলে ,গৌরের রূপ জড়ের রূপ নহে। আমাদের নশ্বর স্থূল ইন্দ্রিয়-তর্পনের জন্য ব্যস্ত হয় - তাহাতে কৃষ্ণবিস্মৃতি হয় মাত্র। শ্রীগৌরহরির অপূর্ব্ব রূপ আর কিছুই নয়- উহার দর্শনে আমাদের ভোগ-প্রতীতির উদ্রেক হওয়া দুরে যাক, ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা নিত্যকালের জন্য থামিয়া যায়। গৌরসুন্দর সাক্ষাৎব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহাতে শ্রীরায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তগণের সেবনীয় বস্তু-বিজ্ঞান উচ্ছলিত হয়, নদীয়া নাগরীগণের জড়ভোগময়ী ধারণার তাৎকালিক বশবর্ত্তিতায় কামরিপু-চরিতার্থতার জন্য জড় নাগর অন্বেষণ করেন। তাহাতে উত্তরোত্তর জড়কাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবকে হরিভজন হইতে বিষয়ভোগে প্রমত্ত করায়। অহৈতুক নির্ম্মল প্রেম তথায় তিরোহিত হইয়া নিজেন্দ্রিয়প্রীতি-তাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হয়। আমরা গেলাম নিজের নিঃশ্রেয় লাভের জন্য, গমনপথে রিপুহস্ত পতিত হইয়া নিত্যকালে জন্য নিত্য ভজন ধ্বংস করিয়া

কর্ম্মকান্ডে ভোগরে আবাহন করিয়া বসিলাম। গেলাম শ্রীজগদগুরুদেবের চরণপ্রান্তে পূজা করিবার জন্য, পড়িলাম ভোগগর্ত্তে। নর্ত্তকীদিগের নৃত্যগীতাদি যেরূপ ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দুর্ব্বল জীবকে মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত করে, আমাদিগকেও গৌরভজন করিবার নামে নাগরীর ভোগ পিপাসা গ্রাস করিয়া ফেলে।

গৌরহরি ভোগের বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি পূজার বস্তু-কৃষ্ণোন্মুখ জীবের ভজনের বস্তু। বিষয়ভোগস্পৃহারত ব্যক্তিগণ কামাদি রিপুষট্‌কের বশবর্ত্তী হইয়া যাদৃশ ভোগময় জগতে বিচরণ করেন, গৌরভজনের ছলনায়ও আমাদের তাদৃশ জড়েন্দ্রিয়পরায়ণতাই বৃদ্ধি লাভ করে। জড়ভোগরত আমরা; আমাদের পতি, পত্নী, পুত্র, প্রভু , ভৃত্য ভোগের বস্তু। গৌরাঙ্গ তাদৃশ অনিত্য, অজ্ঞানময় ও নিরানন্দের আধারমাত্র নহেন। তিনি নদীয়ার নাগরীর ভোগের বস্তু নহেন বলিয়াই নিজ স্বরূপ প্রকট করাইয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি তাঁহাকেও জড় ভোগের অন্যতম বস্তুজ্ঞানে নাগর বলিয়া খাড়া করি এবং আমরা ভোক্তা রমণীসজ্জায় নাগরী বলিয়া অভিমান করি, তাহা হইলে উহা ভজন না বলিয়া জড়েন্দ্রিয়তর্পণ নামে অভিধান করাই আমাদের পক্ষে সত্যপ্রিয়তা। অবশ্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিকূলে ভক্তিগহীন জড়েন্দ্রিয়-ভোগপ্রবণতা শক্তি-উপাসনা তো অনেকদিন হইতেই আছে। শ্রীগৌরসুন্দরকে কেন্দ্র করিয়া গৌরভক্তি কলঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে গৌরকে জড়ের রূপ, জড়ের গুণ, জড়ের ক্রিয়ায় সজ্জিত করিয়া ক্ষণকালের জন্য নিজের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির কল্পনাকে ভজন বলিয়া প্রচার করিতে যাওয়া কি আমাদের

গৌরবিদ্বেষ মাত্র নহে ? গৌরের নাম তো জড়বস্তুর সংজ্ঞাবিশেষ নহে, গৌরের রূপ তো দৃশ্য জড়বস্তুর অন্যতম নহে, গৌরর গুণ তো প্রাকৃত নশ্বর গুণমাত্রের অন্যতাম নহে এবং গৌরলীলা তো ইন্দ্রিয়পরায়ণের ভজন-ছলনামাত্র নহে।

শ্রীগৌরহরির নাম কৃষ্ণচৈতন্য, গৌরহরির রূপ গৌর, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, নিত্য গৌররূপ বলিয়া কৃষ্ণেতর নহেন, তিনি মহাবদান্য অর্থাৎ নির্ব্বোধের প্রতিও তিনি অসামান্য কৃপাবিশিষ্ট অর্থাৎ কোন কৃষ্ণ কর্ম্মের (এর) অনিত্যতা অজ্ঞান-নিরানন্দরূপ অবরতা তাঁহাতে অবৈধভাবে আরোপ করিতে গেলে তিনি সেই আচরণ হইতে বদ্ধজীবকে কৃপা বিতরণে মুক্ত করেন। তাঁহাকে অবৈধ জড়ভোগ-তাড়নায় নাগর বলিতে নাই। নাগরীভাবে তাঁহার ভজন-সাধনের কল্পিত আবাহন কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল পথমাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় শুদ্ধভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত প্রভুগণদ্বারা, শ্রীসনাতন-রূপপ্রমুখ গোস্বমীষটকের দ্বরা, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীদ্বারা, শ্রীগদাধর নরহরি প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তদ্বারা, চতুঃষষ্টি মহান্তদ্বারা, জড়ভোগমিশ্র অনর্থময় সাধনকালের ভক্তির অনুষ্ঠানে সিদ্ধিকালের ভক্তির অনুষ্ঠান অবৈধভাবে সংমিশ্রণে কতই না বাধা দিয়াছেন। কিন্তু আমরা অপরাধী তর্কনিষ্ঠ হৃদয়বিশিষ্ট অনর্থময় জীব সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে জড়বস্তুবিশেষ মনে করিয়া তাঁহাকে জড়-সম্ভোগের মূর্ত্তিমান বিগ্রহরূপে গড়িতে যাইতেছি। ইহা অপেক্ষা আর আমাদের শ্রীগৌরবিদ্বষ কি হইতে পারে ? তাঁহাকে জগদাচার্য্য মুখে বলিয়া জড় কুভোগ-রাজ্যে দুরাচার নাগর বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে যাই বলিয়াই মৃত অক্ষয়কুমার দত্ত, সংস্কৃত 'ভক্তমাল'-লেখক চন্দ্র দততত্ত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় ক্ষীণ সমালোচকও খৃষ্টানদিগের সাময়িক পত্র-প্রচারাখ্য প্রবন্ধাদিতে শ্রীগৌর বিগ্রহকে অবৈধ প্রচারক মাত্র বলিয়া সজ্জিত করায়। বাস্তবিক শ্রীগৌরসুন্দর কি কোন দুরাচার অভিনয় নিজ লীলায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে আমরা দুঃসাহসিকতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অবৈধ ভোগ্য নাগর বলিতে যাই ? পরস্ত্রী-প্রেক্ষণপর পরস্ত্রী-চিন্তনপর, অবৈধ ইন্দ্রিয়তর্পনপর নাগররূপে শ্রীগৌরভক্তগণ কোনদিনই তাঁহাকে কুকর্ম্মরত বলিয়া জানিতে পারেন নাই। তবে নবদ্বীপ-নাগরীবাদ কে উদ্ভাবন করি, কোন্ সময় এই দুর্নীতি ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিল, কাহারাই বা এই দুর্নীতিকে অনর্থময় কালে ধর্ম্মের সাধন-ভজন বলিয় চালাইতে আরম্ভ করিল ? 'ঠাকুর নরহরির সহিত কি এই ভজন-সাধন-বিরোধী অবৈধ অনুষ্ঠানের কোন সম্বন্ধ আছে ":' প্রশ্ন হইলে আমরা বলিতে চাই, যাঁহারা ঠাকুরের ভজনামৃত দেখিয়াছেন, তাঁহাদের এরূপ ভ্রম হইতে পারে না। সিদ্ধ চৈতন্যদাস এই অবৈধ অনুষ্ঠানকে ভজন বলিয়া চালাইয়াছিলেন কি না, তাহারও প্রকৃষ্টপ্রমাণ পাওয়া যায় না। শুদ্ধভক্তগণ বলেন, কতিপয় অবৈধ দুর্নীতিপরচিত্ত ব্যক্তি চৈতন্যদাসের ক্রিয়া-কলাপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাধনক চৈতন্যদাস বলিতে গিয় স্বীয় কুনীতিপুষ্ট চঞ্চল প্রতীতিদ্বারা নিজ ধারণায় সত্যানুষ্ঠানকে বিকৃত করিয়াছেন মাত্র। চিড়িয়া কুঞ্জের সিদ্ধ কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে এই নদীয়া-নাগরীভজনের কথা অন্যায়পূর্ব্বক আরোপ করা সত্যবিরুদ্ধ মাত্র। চৈতন্যদাসের অলৌকিক ভাব বুঝিতে না পারিয়া আমরা যদি তাঁহাকে নদীয়া-নাগরীর দৌরাত্মপূর্ণ অবৈধ সাধক শ্রেণীভুক্ত করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধ ব্যতিত আমরা আর কিছুই করিলাম না। ছাগল-হারাণ বুড়ির রামায়ণের কথক ঠাকুরের দাঁড়ি-সঞ্চালন দেখিয়াও পাঠ-শ্রবণের মত মহৎ বৈষ্ণবগনেণর চরিত্র পবিত্রময় আমি বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া নিজ কুনীতি ভাবের সংযোজন করা আদরণীয় নহে।

যাহারা গৌরসুন্দরের দাসগণের অলৌকিক চেষ্টা নিজের জড় ভোগময় ভাবের অন্যতমজ্ঞানে বুঝিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদিগকে আমরা নির্ব্বোধ বলিয়া স্থির করিলে আর গৌরকথার অনুশীলন করিতে বলিতাম না। তাঁহারা নির্ব্বোধ নহেন বলিয়াই নদীয়া-নাগরীবাদের দুর্গন্ধ তাঁহাহাদিগকে বিজড়িত না করিতে পারে এবং তাদৃশ সাধন- ভজন শুদ্ধভক্তির আদৌ অনুমোদিত নহে বলিয়া জানাইয়া দিবার জন্য সভা-সমিতি পত্রিকাদিতে আলোচনারূপ কৃষ্ণানুশীণনের প্রয়োজনীয়তা ছিল ও আছে। ইহা পরচর্চ্চা নহে, আচার্য্য বা গুরুসেবা। এই আচার্য্যসেবা-রহিত হইলে বদ্ধজীব পরমার্থ-বিষয়ে নির্ব্বোধ হইয়া পড়েন। দুঃসঙ্গপ্রভাবে শুদ্ধভক্তি হইতে বিচ্যুত হইবার কুচেষ্টাই জীবকে গৌরভক্ত হইতে দেয় না। শ্রীগৌরহরি মহাবদান্য বলিয়া কালে কালে ভক্তিবিরাধী সিদ্ধান্তের হস্ত হইতে কুবিষয়-ভোগ-মত্ত তর্কনিষ্ঠ ভক্তিরহিত গৌরভক্ত প্রতিষ্ঠাকামী জনগণকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে নিজ জনসমূহ প্রেরণ করেন। যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় সেই কালে ভগবান এবং ভক্তগণ আসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং জীবকুলের দুর্বাসনা-গঠিত ভজন-ছলনা হইতে নির্ব্বোধ প্রশিক্ষিতগণকে উদ্ধার করেন।

সত্যসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস-দুষ্ট কোন কথাই শ্রীদামোদর স্বরূপ গৌড়ীয়গণের মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হইতে দেয় নাই। শুদ্ধ গৌরভক্তগণ সেই গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীদামোদর স্বরূপের সিদ্ধান্ত, ছয় গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অতুলনীয় গ্রন্থ শ্রীচরিতামৃত হইতে পাইতে পারিবেন। শুদ্ধভক্ত শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস শ্রীচতন্য ভাগবতে নদীয়া-নাগরী -মতের অকর্ম্মণ্যতা-নিরূপণের যে সূত্র দিয়াছেন, তাহা যাহাদের আলোচ্য বিষয় হয় না, তাহারা শুদ্ধভক্তি কাহাকে বলে, তাহার সন্ধান কখনই পাইবেন না। হরিভজন বদ্ধজীববের মনগড়া অনুষ্ঠান মাত্র নহে। যাঁহারা ভগবদ্ভজন না করিয়া অন্য জড় ধারণার সহিত হরিভজনকেও ভোগময় অনুষ্ঠান মনে করেন, তাঁহারাই ভক্তিযাজনের নামে নদীয়া-নাগরীবাদ অন্যায়পূর্ব্বক ভক্তিপথের অন্তর্গত বলিয়া চালাইতে থাকিবেন।

শ্রীনাম

- সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সম্প্রতি অনেকে 'নাম গান করিতেছি' বলিয়া নানাবিধ অশুদ্ধভাব-সংযুক্ত গান সকল গাইয়া থাকেন। তাহা ভাল নয়। প্রথমে এইমাত্র দ্রষ্টব্য যে, নাম-গানে কেবল ভগবল্লীলা-সূচক নাম থাকিবে, আর কোন বাজে কথা থাকিবে না। তবে যদি শুদ্ধভক্তি-সম্মত দুই একটি ভাব থাকে, তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। মুক্তি ও ভুক্তিপিপাসা-সূচক কোন কথা থাকিলে নামের নামত্ব থাকে না, নামাভাস হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন-কৃত নাম ও ভাবসূচক গান ব্যতীত কোন বাজে গান করা উচিত নয়। যে-যে রূপ নাম গান করা উচিত, তাহার উদাহরণ-স্বরূপ মহাজন-মত-সন্মত এই (শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম গান- "নদীয়া নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে," শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিংশোত্তর -শতনাম-সঙ্কীর্ত্তন -"নগরে নগরে গোরা গায় প্রভৃতি) কয়েকটি পদ পুর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে। নামহট্টের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ এই সকল নাম ও এইরূপ নামগান করিবেন ও করাইবেন।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রের আজ্ঞা

অপার-রসপয়োনিধি অখিল -রসামৃত -মূর্ত্তি গৌড়জন-চিত্ত-চকোর-সুধাকর শ্রীশ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু একদিবস নিখিল জীবের প্রতি কৃপা করত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখন্ডে, ১৩শ অধ্যায়ে ইহা লিখিত আছে,-

শুন শুন নিত্যানন্দ , শুন হরিদাস ।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল 'কৃষ্ণ' , ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা।।
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা।।

প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস পরমেশ্বরের সেই আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সাহায্যে ঘরে ঘরে নামপ্রচার করিয়াছিলেন।" বলকৃষ্ণ , ভজ কৃষ্ণ , কর কৃষ্ণ-শিক্ষা"- এই কথাগুলিতে তিনটি পৃথক পৃথক আজ্ঞা লক্ষিত হয়। "বল কৃষ্ণ" এই আজ্ঞার অর্থ এই যে, ' হে জীব, তোমরা সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম কর। "ভজ কৃষ্ণ" এই আজ্ঞার তাৎপর্য এই যে, - হে জীব, তোমরা নামের রূপ-গুণ-লীলারূপ পাপড়ীগুলি প্রস্ফুটিত কর এবং সেই নামরূপ পুষ্পের সুখভোগ কর। "কর কৃষ্ণ-শিক্ষা" এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে,- হে কৃষ্ণ-ভক্তগণ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া সেই নাম- পুষ্পের মধুস্বরূপ পরম-রস ভোগ কর। আমরা এই প্রবন্ধে প্রথম আজ্ঞাটি কিয়ৎপরিমাণে বুঝাইয়া দিব। পরে অন্যান্য প্রবন্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আজ্ঞার বিশেষ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, সকলে নিরন্তর হরিনাম কর। নিরন্তর হরিনাম কর, - এই আজ্ঞার এইরূপ তাৎপর্য নয় যে, দেহ-চেষ্টা, গৃহকার্য্য ও অন্যের প্রতি ব্যবহারশূন্য হইয়া নিরন্তর হরিনাম কর। দেহ-চেষ্টাশূন্য হইলে অল্পক্ষণেই দেহনাশ হইতে পারে। সে-স্থলে হরিনাম আর কিরূপে কে করিবে ? যখন নিরন্তর হরিনাম লইতে মানবগণকে আজ্ঞা দিয়াছেন, তখন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী , বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছাদি- সকলেই স্বীয় স্বীয় অবস্থায় অবস্থিত হইয়া হরিনাম করিবেন, ইহাই একমাত্র তাৎপর্য্য। স্বীয় স্বীয় অবস্থায় সুন্দররূপে অবস্থিত থাকা আবশ্যক। কেননা, সেই সেই অবস্থায় দেহচেষ্টা সুন্দররূপে চলিবে, অকালে দেহাপাত হইবে না। দেহচেষ্টা ও অন্যের সহিত ব্যবহার দেহচেষ্টার অনুগত। সে সমস্তই সুন্দররূপে চলিবে। তবে সেই সকল চেষ্টা নিষ্পাপ ও নিরুপদ্রবভাবে আচরিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম আজ্ঞাটি যখন প্রচার করেন, তখন এইরূপ বলিয়াছেন; যথা-

কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া।।
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ , লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ।।

তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার।।"

শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩/৮২-৮৪

প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস নাম- প্রচারের আজ্ঞা লাভ করিয়া গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে গিয়া বলিতে লাগিলেন,- " হে জীব, কৃষ্ণই জীবের জীবন। কৃষ্ণনামই জীবের ধন। তোমরা নিরন্তর সেই নামের আলোচনা কর। কেবল এইমাত্র দৃষ্টি রাখিবে যে, দেহ-গেহাদি-চেষ্টায় যেন কোন-প্রকার অনাচার না হয়।।" 'অনাচার' শব্দের অর্থ অসদাচার। অনৃত-ভাষণ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য , চৌর্য্য, লাম্পট্য, পরের অপকার , জীব-হিংসা, গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি বহুবিধ পাপই অসদাচার বা অনাচার। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং এইরূপ 'অনাচার' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন-

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্, সব নিমু মুঞি।।
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি, না করিহ আর ।।

অনাচার ছাড়িয়া হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেওয়ায় পক্ষান্তরে সদাচার আচরণপূর্ব্বক হরিনাম লইবার উপদেশ হইয়াছে।

ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ।।
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া।।

প্রভু কহিলেন,- হে বিপ্র! তুমি অধর্ম্ম-পথ একেবারে পরিত্যাগ কর । আর অধর্ম্ম আচরণ করিও না। কেবল অধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না, কিন্তু যত্ন-সহকারে ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন কর। ধর্ম্ম যথা -

সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জ্জবম্ ।।
সন্তোষঃ সমদৃকসেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ
নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্।
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ ।
তেষবাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব।।
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্।
নৃণাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি ।।

(শ্রী ভাঃ ১১/৭/৮-১২)

নারদ কহিলেন, - হে যুধিষ্ঠির ! সত্য, দয়া, সদ্বিষয়-অভ্যাস, শৌচ, তিতিক্ষা, ঈক্ষা অর্থাৎ যুক্তাযুক্ত-বিবেক, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, সাধু-সেবা, ক্রমবৈরাগ্য, জীবের অপগতি-বিচার, বৃথালাপ-নিবৃত্তি, আত্মানুসন্ধান, যথাযোগ্য-পাত্রে অন্নাদি বন্টন করিয়া গ্রহণ, অতিথিকে দেবতাবুদ্ধি, সর্ব্বমানবে কৃষ্ণসম্বন্ধ-দর্শন, হরিকথা শ্রবণ , কীর্ত্তন, হরি-স্মরণ, সেবা, পূজা, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ- এই ত্রিশটি ধর্ম্ম মানবমাত্রেরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানিবে।

হে ভ্রাতৃবর্গ! জীবনযাত্রার জন্য যে ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা কর, তাহাই কর এবং নিরন্তর হরিনাম করিতে থাক। এইমাত্র উপদেশ।

(১২ পৃষ্ঠার পর কলিযুগে প্রেমভক্তির অস্ত্রশস্ত্রাদি)

প্রতিনিধিত্বে রয়েছেন শ্রীবাস পণ্ডিত। আর গদাধর পণ্ডিত হচ্ছেন 'ভক্তিশক্তি'– প্রেম ও সেবা বৃত্তির শক্তি। তিনি ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের সব শক্তিই এই পাঁচ তত্ত্বের মধ্যে নিহিত রয়েছে। তা ছাড়া যে শক্তি রয়েছে তা হল বহিরঙ্গা শক্তি অর্থাৎ এই জড় জগৎ, যেখানে পঞ্চতত্ত্ব সহ মহাপ্রভু লীলাবিলাসের জন্য এসেছিলেন।

শ্রীবাসপণ্ডিত একজন আর্দশ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে শ্রীবাস পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল এই পৃথিবীতে, শ্রীহট্ট নামক গ্রামে। তাঁর তিন ভাই ছিল শ্রীনিধি, শ্রীরাম এবং শ্রীপতি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে তিনি তাঁর কনিষ্ঠদের কীর্তন, ভাগবত পাঠ ইত্যাদি ভক্তি চর্চায় এগিয়ে নিয়ে যেতেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর সাথে তার মিত্রতা হয় এবং অদ্বৈত প্রভুর টোলে গিয়ে তিনি প্রায়ই শাস্ত্র আলোচনা, অধ্যয়ন করতেন এবং একসাথে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করতেন। নবদ্বীপে এই সময়ে বহুসংখ্যক শক্তি ও দুর্গাদেবীর উপাসকদের মাঝে তাঁরা ছিলেন সংখ্যালঘু। ক্ষমতালাভ, প্রতিষ্ঠা, আভিজাত্য ইত্যাদির উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা থাকলেও কৃষ্ণভাবনার শিক্ষা তখন সেখানে ছিল না।

এই রকম পরিস্থিতিতে শ্রীবাস ঠাকুরের হরেকৃষ্ণ কীর্তন করছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছিলেন তিনি যেন তাঁর অবতরণ লীলা প্রকাশ করে এই পরিবেশকে শুদ্ধতা প্রদান করেন।

একই সময়ে শ্রীবাস পণ্ডিতের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার। শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁর পত্নী মালিনী দেবী বয়সে অগ্রজ হওয়ার দরুন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র তাঁদের বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করতেন এবং ব্রাহ্মণ হিসাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন।

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন বহু কারণে। কিন্তু প্রধান কারণ দুটির মধ্যে হচ্ছে শ্রীবাস ঠাকুরের শুদ্ধ ভক্তিযুক্ত প্রার্থনা। সেই সাথে অদ্বৈত আচার্যের কীর্তন ও আবেদনই এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতরণের কারণ হয়েছিল।

বৃন্দাবন গোপীরা যেমন শিশু কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখবার জন্য নন্দগ্রামে আসেতন, ঠিক তেমনই মালিনী দেবী মহাপ্রভুর জন্মের পর শচীমাতার কাছে আসতেন ও পরামর্শ দিতেন। নিমাইও শ্রীবাস পণ্ডিতের বড় দালানে, থামওয়ালা ফুলের বাগানে সজ্জিত বাড়িতে যেতে বড় ভালবাসতেন।

নিমাই তাঁর প্রথম লীলা শুরু করেন শিক্ষা দিয়ে। নিজে পণ্ডিত হয়ে বহু পরিভ্রমণকারী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের তিনি তর্কে পরাস্ত করেন। এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ লীলাকালেই তাঁর সংকীর্তন আন্দোলনের যে উদ্দেশ্যে তা প্রকাশ করলেন।

রামরাজত্ব

– শ্রীমৎ সুভগ স্বামী মহারাজ

সকলেই কিংডম অফ্ গড বা রামরাজ্য কথার সঙ্গে পরিচিত। এই জগৎ এমন হয়ে উঠুক– অনেকেরই সেটা একান্ত ইচ্ছা। দুর্ভাগ্য বশত প্রায় খুব কম সংখ্যক লোকই কিন্তু ভগবৎ শরণাগত হয়। ক'জনই বা ভগবানের, রামের শরণাগত হয়? কিন্তু তারা রামরাজ্যে বসবাস করতে চায়। রামকে বাদ দিয়ে, ভগবানকে বাদ দিয়ে, রামরাজ্য কি করে সম্ভব? ভগবানের আদেশ, ভগবানের নির্দেশ যদি আমরা না মানি, তা হলে কি করে আমার দেশ রামরাজ্য হবে?

হ্যাঁ, ভগবৎ শরণাগত হলে, ভগবৎ আদেশ পালন করলে, সেটা সম্ভব। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের সময় প্রজারা সকলেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে তাদের পিতারূপে গ্রহণ করে তাঁর শরণাগত হয়ে, নিজ নিজ ধর্ম ও আশ্রম অনুযায়ী কর্তব্য কর্ম করে জীবন যাপন করত। তারা সকলে পরম সুখ ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। পিতা যেমন সন্তানদের শাসন করেন, পালন করেন, শ্রীরামচন্দ্রও তাঁর প্রজাদের সেই রকমভাবেই শাসন করতেন, পালন করতেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে রামরাজত্বের কথা। সেখানে শ্রীল ব্যাসদেব লিখেছেন– ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রজারা সকলেই ছিল ধার্মিক, তারা সকলেই শান্তিপূর্ণ ও সুখী জীবন যাপন করত, কারণ শ্রীরামচন্দ্রের শাসনব্যবস্থা ছিল সর্বোত্তম। রামরাজত্বে সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর সকল দেশ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ও বন-জঙ্গলে সকল জীবকূলের জীবন ধারণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রীই অপর্যাপ্তভাবে পাওয়া যেত, উৎপন্ন হত।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল ব্যাসদেব তা এইভাবে ব্যক্ত করেছেন–

বনানি নদ্যো গিরয়ো বর্ষাণি দ্বীপসিন্ধবঃ।
সর্বে কামদুঘা আসন্ প্রজানাং ভরতর্ষভ॥

(ভাগবত ৯/১০/৫২)

এমন কি জনগণ রোগ, শোক, দুঃখ-দুর্দশা, জরা-ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল; শুধু তাই নয়, যারা মরতে চাইত না, তারা মরত না। শুকদেব গোস্বামী তাই মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছেন–

নাধিব্যাধিজরাগ্লানিদুঃখশোকভয়ক্লমাঃ।
মৃত্যুশ্চানিচ্ছতাং নাসীদ্ রামে রাজন্যধোক্ষজে॥

(ভাগবত ৯/১০/৫৩)

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে এতই ঐশ্বর্য ছিল যে রাজধানী অযোধ্যার পথে পথে হাতিদ্বারা সুগন্ধি জল সিঞ্চন করা হত। অযোধ্যা নগরীকে সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র দ্বারা হত। নগরবাসী প্রজারা

তাই অযোধ্যা নগরীকে এইভাবে আড়ম্বরপূর্ণ রাখায় খুবই তুষ্ট হয়েছিল। প্রাসাদ, প্রাসাদগুলির দ্বার, গোপুর, সভাগৃহ, মন্দিরাদিতে সোনার কলস ও বিভিন্ন রকম পতাকা শোভা বর্ধন করত।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেখানেই পরিদর্শন করতে যেতেন পবিত্র কলাগাছ, ফুল, ফল, পতাকা দ্বারা তৈরি সুন্দর তোরণ করা হত তাঁকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে। উপাসনার বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে প্রজারা শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাতে আসত, তারপর কাতরভাবে তাঁর কাছে শুভ আশীর্বাদ প্রার্থনা করত। তারা এইভাবে আবেদন করত, "হে ভগবান, বরাহ অবতারে আপনি সাগরগর্ভ থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন, এখন আপনি সেই জগৎকে প্রতিপালন করুন। আপনার কাছে আমাদের এই কাতর প্রার্থনা।" ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন–

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

(গীতা ৪/১৩)

অর্থাৎ গুণ ও কর্ম অনুযায়ী মানব সমাজকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। এরা হচ্ছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সমাজে চারটি আশ্রম আছে– এগুলি হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। একে বলা হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী সমাজ গঠন করা উচিত। আদর্শ শাসকের উচিত এই বর্ণাশ্রম ধর্ম চালু করা। এই ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ভগবৎ ভাবনাময় করে তোলা। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে–

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ বিষ্ণুরারাধ্যতে।

(বিষ্ণুপুরাণ ৩/৮/৮)

এইভাবে সকল নাগরিককে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করা যায়।

আদর্শ পিতা যেমন স্নেহের সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দান করেন, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও ছিলেন আদর্শ পিতার মত। তিনি প্রজাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন; নিজ নিজ গুণ ও কর্ম অনুযায়ী প্রজাদের স্বধর্ম অনুশীলনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তাঁর রাজত্বকালে।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

(গীতা ৩/২১)

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ থেকে জনগণের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে–

'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। শাস্ত্রের বাণী অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তা উপলব্ধি করে, জনগণকে আদর্শ নাগরিক ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবে পরিণত করে, এক ভগবৎ ভাবনাময় সমাজ গড়ে তোলাই আদর্শ শাসকের কর্তব্য।

তাই সারা বিশ্বের নেতাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবানের শুদ্ধভক্তরা তাদের গুণ ও কর্ম অনুযায়ী জীবন যাপন করে দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুযায়ী জীবন যাপন করে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করে, বিশ্বময় জনগণকে জীবন সার্থক ও পূর্ণ করবার পন্থা দেখিয়েছেন। কলের্দোষনিধে রাজন্– শাস্ত্রের এই বাণী অনুযায়ী কলিযুগে দোষ-ত্রুটি অসংখ্য। পাপ জীবনের স্তম্ভ-স্বরূপ হচ্ছে–

অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষাহার, আসব পান, দ্যূতক্রীড়া আদর্শ শাসকের উচিত প্রজাদের এই সব পাপ-কর্ম থেকে মুক্ত করা; ভক্তরাজ পরীক্ষিৎ মহারাজের শাসন ব্যবস্থা থেকে এই শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারি।

আজকাল পৃথিবীর সব দেশেই বিধানসভা, সংসদ আদি আছে, সদস্যরা দেশের আইন প্রণয়ন করছেন, কিন্তু তবু দেশে চোর আছে, তস্কর আছে, কালোবাজারী আছে, কিন্তু কেন? তার কারণ হচ্ছে শুধু আইন পাশ করে, জনগণকে সুনাগরিক করা যায় না, তাদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবান করা যায় না। তা কখন সম্ভব নয়। এ সব কাজ জোর জবরদস্তিতে হয় না, বলপ্রয়োগ করে হয় না। এর জন্য জনগণকে সুনাগরিক হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষা দেওয়ার জন্য, কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার জন্য, প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কম বেশি বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম শিক্ষায়তন ও বিভাগ রয়েছে।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে– বর্ণাশ্রম গুণান্বিতঃ। জনগণকে সুনাগরিক করে তোলার জন্য রাজ্যের আইনকানুন মান্য করবার জন্য এক পরিবেশ গড়ে তোলা যায়। প্রাথমিক অবস্থা গড়ে তোলা যায় বিশেষ বিশেষ শিক্ষায়তানে

জনগণকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে– ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে।

পুরাকালে রাজাকে বলা হত নরদেবতা। তাঁকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মান্য করা হত। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণদের পরামর্শে দেশ শাসন ও প্রজা পালন করতেন, সকলকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র সেইভাবেই তাঁর রাজ্য শাসন করতেন। তিনি ছিলেন ভগবান; তবু মানব সমাজকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি শাস্ত্র-সম্মতভাবে আচরণ করে সকলকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই কারণে রাজ্যের প্রধানকে কখন কখন রাজর্ষিও বলা হত। কারণ রাজা হলেও, তাঁদের চরিত্র, তাঁদের আচার-ব্যবহার ছিল ঋষির মত। তারা ছিলেন আদর্শ শাসক; তাদের সঙ্গে নাগরিক বা প্রজাদের সম্বন্ধ সহজবোধ্য ছিল; তাই রাজ্যে তেমন কোন চোর, দস্যু, তস্করের উপদ্রব বা উৎপীড়ন ছিল না। তাই রামরাজত্বে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা ছিল, এবং প্রজারা সুখে ও শান্তিতে বাস করত। কিন্তু গণতন্ত্রের যুগে, কলিযুগে তা হচ্ছে না; কেন না এখন বর্ণাশ্রম শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। দস্যু, তস্করের রাজত্ব চলছে। আজ সকলেই প্রতারকদের হাতে প্রতারিত হচ্ছে। শাসকবর্গ 'কর'–এর নামে জনগণের বহু কষ্টার্জিত ধন অপহরণ করছে। জনগণও নানা উপায়ে 'কর' ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে আজ পৃথিবীর দেশে দেশে শাসন ব্যবস্থায় এক বিশৃঙ্খলা এসেছে,– এক বিপর্যয় এসে উপস্থিত হয়েছে।

এই বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের পথ ভগবান বা তাঁর শুদ্ধ-ভক্তরাই দেখাতে পারেন। তাই তারা বিশ্বের সকল দেশ

নেতা থেকে শুরু করে জনগণকে ভগবৎ ভাবনা অনুশীলনে, বিশেষভাবে বর্তমান যুগে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনী উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেন। তাই নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিশ্বময় কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করে গেলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাদর্শে বর্তমান যুগের দেশনেতাদের উদ্বুদ্ধ হওয়া চাই; পাপময় জীবন ত্যাগ করে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করা চাই। শাস্ত্র অনুযায়ী কলিযুগে সুখ ও শান্তির একমাত্র পথ সংকীর্তন যজ্ঞ। তাই মহামন্ত্র কীর্তন করা চাই–

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এইভাবে দেশে আদর্শ নেতাগণ, ভগবৎ ভাবনাময় নেতা হলে দেশবাসীও সুনাগরিক হবে; দেশে দেশে সুখ ও শান্তি বিরাজ করবে।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন আদর্শ শাসক। তিনি শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন কিভাবে দেশ শাসন করলে, প্রজা পালন করলে সারা বিশ্বে জনগণ সুখ ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং এই রকম ভগবৎ ভাবনাময় জীবনে জনগণের জীবন সার্থক হতে পারে। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে আদর্শ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি ছিল, তারা সেই ভাবে আচরণ করত।

একজন আদর্শ গৃহস্থ শ্রীরামচন্দ্র আচার্যের উপদেশে প্রাতে যজ্ঞানুষ্ঠান লীলা করতেন। ব্যক্তিগত অলঙ্কার ও পোশাক ছাড়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সব কিছুই ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। ব্রাহ্মণরা শ্রীরামচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন; শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ব্রাহ্মণদেরও গভীর প্রীতিভাব ছিল। তাই শ্রীরামচন্দ্রের প্রদত্ত সব দানই তারা প্রত্যর্পণ করতেন; প্রীতি-বিগলিত হৃদয়ে তারা বলতেন, "হে প্রভু, আপনি নিখিল ভুবনের ঈশ্বর; আমাদের জড় জাগতিক বিষয় সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই। আপনি আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে, জ্ঞানালোকের মাধ্যমে যে তম-অন্ধকার দূর করেন, সেইটি আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।"

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় যখন রাজ্য শাসন লীলা করতেন, তখন অযোধ্যাবাসী প্রজারা শ্রীরামচন্দ্রকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে, তাঁর চরণকমল স্পর্শ করে, পিতার মত মহারাজকে দর্শন করে, কখনবা বন্ধুর মত তাঁর পাশে উপবেশন করে, কিংবা তার পূত সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছিল এবং তাঁর সেবা করে তাদের জীবন সফল ও সার্থক করে তুলেছিল।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি–এই চার যুগের মধ্যে কলিযুগই সবচেয়ে দুঃখজনক; কিন্তু এই যুগে–

অস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

ভগবানের নাম (রাম, কৃষ্ণ আদি) কীর্তন করে কলির প্রভাব থেকে জনগণ মুক্ত হতে পারে, সকল কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারে। এই যুগে এইটি সুখ-শান্তিময় ভগবৎ ভাবনাপূর্ণ জীবন লাভের সুবর্ণ সুযোগ।

ভগবান শ্রীরামই আবার এই যুগে শ্রীগৌরসুন্দর রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি পতিতপাবন। কলিযুগে জনগণ সকলেই প্রায় পতিত। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের রামরাজ্য বা ভগবানের রাজ্যে বসবাসের পথ দেখিয়েছেন। ভগবানের নাম ও তিনি অভিন্ন; শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন। তাই নিরপরাধে আমরা ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করতে পারি– সদাচার পালন করতে পারি– অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষাহার, আসব পান, জুয়াখেলাদি পরিত্যাগ করে। আর যদি নিয়ত আমরা শুধু ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করি, রামরাজত্ব এই কলিযুগেই তখুনি শুরু হয়ে যাবে।

'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।' কলিযুগে এই দুঃসময়ে বিশ্বময় ভগবানের নাম কীর্তন–'হরি সংকীর্তন যজ্ঞ' হওয়া জরুরি ও একান্ত প্রয়োজন।

---

৪ পৃষ্ঠার পর (কৃষ্ণভাবনামৃত প্রত্যেকেরই অন্তরে রয়েছে)

শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নাম জপের মাধ্যমেই, এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করলেই, 'মুক্তসঙ্গঃ' মানুষ এই কলিযুগের সমস্ত কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। 'পরং ব্রজেৎ' পরম ধামে ভগবদ্ধামে, নিজ আলয়ে মানুষ তখন চলে যায়। দেখতেই পাচ্ছেন। গল্পকথা নয়। এই সমস্ত ইউরোপীয়ান আর আমেরিকান ছেলে-মেয়েগুলি, কেমন বোধ করছে, কেমনভাবে তারা সুন্দর আনন্দে নাচছে ভগবানের নাম কীর্তন করতে করতে। যয়াত্মা সুপ্রসীদতি। তারা যদি তৃপ্তি লাভ না করে থাকে তো আমাদের সঙ্গে তারা কীর্তন করছে, নাচছে কেন? পারত না। ওরা কুকুর বেড়াল নয় যে, আমি তাদের শিখিয়েছি যে, "তোমরা এইভাবে নাচতে থাকো, বেশ পয়সা কামাবে।"

না, ওরা নাচছে ভগবৎ প্রেমের ভাবাবেশে। যয়াত্মা সুপ্রসীদতি। তা না হলে আমার কি এমন টাকা আছে যে, ওদের মন ভুলিয়ে নিয়ে আসতে পারি? আমি গরিব ভারতবাসী। না। ওরা ভগবৎ প্রেমের ভাবোন্মাদনা অর্জন করতে পেরেছে। এমন কি ক্রিশ্চান পাদরীরাও স্বীকার করছেন যে, "এই সব ছেলেরা, এই সব মেয়েরা তো আমাদেরই সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়ে। এখন এখানে নাচছে... যখন ওরা ক্রিশ্চান ছিল গির্জায় তো আসত না। মানতই না। এখন ছেলেগুলি ভগবৎ-চিন্তায় পাগল হয়ে উঠেছে।"

তাই বলছি, কৃষ্ণভাবনামৃত প্রত্যেকেরই অন্তরে রয়েছে। সেটা কোন কৃত্রিম ব্যাপার নয় মোটেই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে হয়েছে,

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

কলিযুগে প্রেমভক্তির অস্ত্রশস্ত্রাদি

– শ্রীমৎ মহানিধি স্বামী

২২ জুন ১৯৯৫ শ্রীধাম মায়াপুরে চন্দ্রোদয় মন্দির-কক্ষে শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে প্রদত্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রবচন

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন যে, কেউ যদি পারমার্থিক উন্নতি করতে চায়, তাকে ভগবানের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবশ্যই অবগত হতে হবে; সেই গুলি হল– ভক্তরূপে মহাপ্রভু, ভক্তস্বরূপে নিত্যানন্দ প্রভু, ভক্ত অবতারে অদ্বৈত আচার্য, ভক্ত শ্রীবাস এবং শক্তি অবতার রূপে গদাধর পণ্ডিত।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য শ্রীচৈতন্যদেবের বিভিন্ন লীলাবিলাসে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর পার্ষদদের ও মিত্রদের মাধ্যমে, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে তাঁর অস্ত্রশস্ত্রাদি। বিভিন্ন যুগে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পার্ষদদের বিভিন্ন অস্ত্ররূপে আসেন, যেমন– শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম– এঁরা হচ্ছেন ভগবানের পার্ষদ। কিন্তু বৈকুণ্ঠে এই অস্ত্রগুলির ব্যক্তিগত রূপ রয়েছে। তাঁরা ভগবানের পাশেই বিরাজ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা আছে যে, কলিযুগে যাঁরা বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন হবেন, তাঁরা

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'

–এই সংকীর্তনের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করবেন। তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর গৌরাবতার রূপে ভজনা করবেন এবং তাঁর সকল পার্ষদগণ– তাঁর বাবা, মা, ভাই, সকলেই অবতীর্ণ হবেন তাঁর লীলাবিলাসে সহায়তা করার জন্য।

শ্রীচৈতন্যদেব চক্র, গদা ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র নিয়ে আসবেন না; তাঁর অস্ত্রশস্ত্রাদি হবেন তাঁর পার্ষদগণ। যেমন, জগাই-মাধাই লীলায়–তারা নিত্যানন্দ প্রভুকে অপমান করায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে শ্রীবিষ্ণুর আবেশে সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করেছিলেন। জগাই-মাধাইকে বধ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, যিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশ, তিনি আবেদন করলেন, 'দয়া করে মাধাইকে বধ কোরো না, বরং তোমার অহৈতুকী কৃপা-অস্ত্র দিয়ে তার আসুরিক প্রবৃত্তিকে সংহার কর।"

অতএব ভগবানের যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য, তা এই কলিযুগে দিব্য রূপ নিয়ে এসেছেন, তাঁরাও অস্ত্রশস্ত্র, তবে প্রেমের অস্ত্র। কারণ এই জগতে সৌন্দর্য ও প্রেমই বড় কথা। কোনও রাষ্ট্রের প্রচুর সৈন্যসামন্ত, শক্তি, সম্পদ থাকতে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভক্তরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ), প্রভু নিত্যানন্দ (ভগবানের স্বরূপ), শ্রীঅদ্বৈত (ভগবানের অবতার), ও শ্রীবাস ঠাকুর (ভগবানের আদর্শ ভক্ত)

পারে কিন্তু তাদের রাষ্ট্রনেতা যদি কোনও স্ত্রীলোকের দুটি চোখের মণি, দুটি বঙ্কিম ভ্রূয়ের দ্বারা বশীভূত হয়ে যায়, তা হলে সবই বৃথা। গ্রীক সম্রাট জুলিয়াস সীজারের এত সৈন্য, এত ক্ষমতা ছিল যে, সে বিশ্ব জয় করে নিতে পারত। কিন্তু যখন সে এক সুন্দরী রমণী ক্লীওপেট্রার রূপের আকর্ষণে বশীভূত হল, তখন তার সমস্ত রাজ্য হারিয়ে গেল। সুতরাং সৌন্দর্য ও প্রেমই সব চেয়ে শক্তিশালী। তবে এই জগতের তথাকথিত প্রেম হচ্ছে চিন্ময় জগতের শুদ্ধ প্রেমের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। এই জগতে প্রেম নেই। সবই কাম।

তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে শুদ্ধ প্রেমভক্তির অস্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ছিলেন জীবতত্ত্বের প্রতিভূ।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এসেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব রূপে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলিত রূপে, নিত্যানন্দ প্রভু হলেন স্বয়ং বলরাম; অর্থাৎ মহাপ্রভুর ভ্রাতারূপে তাঁর স্বরূপ। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য হলেন তাঁর অবতার (বিষ্ণুতত্ত্ব) এবং তারপর আমরা অর্থাৎ জীবেরা হলাম তাঁর তটস্থা শক্তি, যার

(বাকি অংশ ৮ পৃষ্ঠায়)

কলিযুগের ভণ্ড অবতার

– শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ

বর্তমান যুগে বহু নতুন ভগবানের উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান যুগের বহু তথাকথিত ভগবান মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে কলিযুগে কোন অবতার অবতীর্ণ হন না, তাই ভগবানের একটি নাম ত্রিযুগ। তারপরেও যে কোন মানুষ কিছু চমৎকারিতা দেখাতে পারলে সাধারণ মানুষ তাকে ভগবান বলে ভক্তি করেন, পূজা বা উপাসনা করেন। কিন্তু আমাদের জানা উচিত ভগবান কিভাবে কিরূপে অবতীর্ণ হন। কেননা ভগবানের অবতরণের সমস্ত বিষয় আগে থেকে শাস্ত্রে ঘোষণা করা আছে– যেমন কল্কি অবতার কলিযুগের শেষে অবতীর্ণ হবেন। কোন গ্রামে কার পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করবেন একথা পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। চৈতন্য রূপে ভগবান নবদ্বীপে অবতীর্ণ হবেন সে কথা বহু পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই যে কোন লোকের মধ্যে কিছু আলৌকিকত্ব দর্শন করেই তাকে ভগবান বলে গ্রহণ করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন নয়। ভগবান মানে যাঁর মধ্যে ছয়টি গুণ পূর্ণ মাত্রায় থাকবে– তিনিই ভগবান। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্তা। যে কোন মানুষকে ভগবান বলে সম্বোধন করা মহা অপরাধ। যারা এ প্রকার ভগবানদের অনুগামী হবেন, তারা সেই ভগবানসহ দুর্গতি লাভ করবেন। উন্নতি লাভ দূরের কথা মহা দুর্গতি লাভ করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কলিযুগে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এরূপ বহু তথাকথিত ভগবান সামনে দেখা দেবে। এভাবে আস্তে আস্তে শাস্ত্র বর্ণিত যথার্থ ভগবান কৃষ্ণ, রাম, নারায়ণ, বামন, নৃসিংহ প্রভৃতি থেকে কলিযুগের যুগ-সম্রাট কলি তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষকে সব সময় দূরেই রাখতে চেষ্টা করবে-এটি আমাদের জানা উচিত। মানব সমাজের সর্তক থাকা উচিত, যে কোন মানুষকে ভগবান পদ-মর্যাদায় বসানো উচিত নয়। এটা অপরাধ। অনেক সময় আমরা দেখতে পাই সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন চমৎকারিতা অথবা সদগুণাবলী দেখা দিলেই সমাজ তাকে সাধু-পদ-বাচ্য মনে করে, কিছুদিন পরে তার ভাল গুণের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে সমাজে গুরুদেবকে মানুষ ভগবানের সমপর্যায় ভুক্ত করে। এটা দুর্ভাগ্য যে এ প্রকার তথাকথিত সাধু-গুরুর সংসর্গে যারা আসেন, তারা তাকে যে ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত করেন শুধু তা নয়, এমনটি আসল ভগবান কৃষ্ণ, নারায়ণ, রাম প্রভৃতি ভগবৎ ভজনাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই তথাকথিত ভগবানের পূজায় ব্যস্ত থাকার দুঃসাহস করতে থাকেন। এভাবে সমাজের মানুষ প্রবঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এটি সমাজের বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন–আমাদের ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ যেন ভগবানের ফ্যাক্টরী খুলেছে। তাই সাধারণ মানুষকে এ সর্ম্পকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। তথাকথিত ভগবানকে পূজা করার পরিবর্তে আমরা তাদের সাধনার প্রতি সম্মান জানাতে পারি। তাদের সিদ্ধপুরুষ রূপে সম্মান প্রদান করতে পারি কোন সাধারণ ব্যক্তি হোক বা অসাধারণ ব্যক্তি হোক, সে যদি ভগবানের সম পর্যায়ভূক্ত হতে চেষ্টা করে তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

এমনও দেখা যায় এই সমস্ত মানুষেরা, যারা নিজেকে ভগবান বলে জাহির করে, তারা চরণে তুলসী নিতে পর্যন্ত দুঃসাহস করে থাকেন। শাস্ত্র অনুসারে তুলসী কেবলমাত্র বিষ্ণুর চরণেই দেওয়া যায়। বিষ্ণু তত্ত্বের চরণে দেওয়ার যোগ্য তুলসী এমনকি দেবতাদেরও দেওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণ জীব কি সাহসে তাদের চরণে তুলসী গ্রহণ করে থাকেন? এই প্রকার অপকর্মের জন্য তথাকথিত ভগবান ও তাদের অনুগামী সবাইকে দুর্দশাগ্রস্থ বা নরকগামী হতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই কলিযুগে ভগবানের অবতার সম্বন্ধে কিভাবে জানা যাবে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছিলেন।

"প্রভু কহে, অন্য অবতার শাস্ত্র দ্বারে জানি।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি॥
সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য-শাস্ত্র পরমান।
অবতার নাহি কহে-'আমি অবতার'।
মুনি সব জানি' করে লক্ষণ-বিচার ॥"

ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ তাঁর রচিত মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থের চর্তুদশ অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবী অবতার শীর্ষক বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন, "আধুনিক কালেও বাংলাদেশে অনেক অভিনব অবতার দেখা দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাহাদের কেহ কেহ নাকি শ্রীগৌরাঙ্গ আবার কেহ কেহ নাকি অন্য ভগবৎ-স্বরূপ: একাধিক ভগবৎ স্বরূপের সমাবেশও নাকি কাহারো কাহারো মধ্যে বিদ্যমান।

আবার এমনও কেহ কেহ আছেন, যাহারা নিজগণকে ভগবান বলিতেন না, কিন্তু তাহাদের দেহ ত্যাগের পরেই তাহাদের শিষ্য ও অনুগত ব্যক্তিগণ তাহাদের ভগবত্তা প্রচার করিয়া থাকেন। আবার এমনও কেহ কেহ নাকি আছেন, যাহারা নিজগণকে কোন ভগবৎ স্বরূপ বলিয়া প্রচার করেন না, কিন্তু তাহাদের সাক্ষাতে তাহাদের শিষ্য আদি ভগবত্তার কথা লোক গণের মধ্যে প্রচার করিলেও তাহারা বাধা প্রদান করেন না, কিংবা কখনো প্রতিবাদ করেন না।

(বাকি অংশ ১৯ পৃষ্ঠায়)

আমি কেন এই জড় জগতে এসেছি?

- শ্রীমৎ হরিকেশ স্বামী

ভাষান্তর-
মৃত্যুঞ্জয় নিমাই দাস
ছাত্র,পশুবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২।

Why Did I Come to This Material World?
By Harikesha Swami - এর বঙ্গানুবাদ
(উৎস গ্রন্থঃ Our Original Position)

কেউ সঙ্গত কারণে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "যদি আমি প্রকৃত পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন শুদ্ধ দাস হয়ে থাকি তবে কেন আমি প্রথমবারে এই জড় জগতে এসেছিলাম? যদি চিন্ময় জগতে কোন অজ্ঞানতা না থাকে তবে কেন আমি সেই চমৎকার স্থানটি পরিত্যাগ করে এখানে এসেছিলাম, যেখানে আমি পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করছি? এটি একটি ভাল প্রশ্ন এবং শ্রীল প্রভুপাদ সেটির বিস্তৃত ব্যাখা দিয়েছেন।

চিন্ময় জগতেই হোক বা জড় জগতেই হোক প্রত্যেক জীবের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। যেহেতু আমরা হচ্ছি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ, আমাদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিমানে তাঁর গুণাবলী রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি গুণ হচ্ছে- তাঁর স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, যখন ইচ্ছা তখনই করতে পারেন এবং তা হচ্ছে সবসময়ই নির্ভুল। তিনি কখনই তাঁর সিদ্ধান্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আবদ্ধ নন। কারণ তিনি হচ্ছেন অপ্রাকৃত ও চিন্ময় যা হচ্ছে জড় অস্তিত্বের বিপরীত। যেহেতু আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমপরিমাণে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী নই, আমরা আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে কখনো বাস্তবে রূপদান করতে পারি, কখানো পারিনা। অধিকন্ত, যখন আমরা কোন কর্ম করি, আমরা সেই কর্মের ফলস্বরূপ সুখ বা দু:খ ভোগ করি।

চিজ্জগতের সকল জীবই শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন। এটি হচ্ছে চিজ্জগতের বৈশিষ্ট্য। তবে সেই ভালোবাসা কখনোই জবরদস্তিপূর্বক নয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, যদি আমি আপনার মস্তকে একটি বন্দুক ধারণ করে বলি, " আমাকে ভালোবাসুন।" আপনি তখন সহজেই বলবেন, " ও, হ্যাঁ! আমি আপনাকে ভালোবাসি।" কিন্ত তার কোন অর্থ নেই। আপনি কোন ব্যক্তিকে জোর করতে পারেন না অন্য কাউকে ভালোবাসার জন্য, যেহেতু ভালোবাসা উৎসারিত হয় হৃদয় থেকে স্বাভাবিকভাবে যখন কোন কারন বর্তমান থাকে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কাউকে জোর করেন না তাঁকে ভালোবাসার জন্য, কারন তা প্রকৃত ভালোবাসা হবেনা এবং তা তাঁর প্রীতিসম্পাদক হবেনা, যিনি সবকিছুই জানেন যা কিছু আমাদের হৃদয়ে ঘটছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন শুধুমাত্র শুদ্ধ, স্বাভাবিক ও স্বত:স্ফূর্ত ভালোবাসার দ্বারা যা জীবের স্বকল্পিত যেকোন বাসনা থেকে মুক্ত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক জীবকে স্বাধীন ইচ্ছা করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এই স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা কোন জীব শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসতে পারে আবার নাও পারে, এর পচ্ছন্দ সম্পুর্ণরূপে নির্ভর করছে জীবের উপর। যে সমস্ত জীব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসে তারা অবস্থান করে চিন্ময় জগতে এবং যারা শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসেনা তারা জড় জগতে অবস্থান করে।

যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসেনা অথবা যারা পরম ভোক্তা হিসেবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবস্থানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ তারা ক্ষণকালও চিন্ময় জগতে অবস্থান করতে পারেনা।

স্মরণ রাখুন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসা অথবা না ভালোবাসার পছন্দ আমাদের মধ্যে নিত্য বিরাজমান আছে। ঈর্ষা উদ্ভূত হয় ভালোবাসার বিপরীতরূপে যা সৃষ্টি হয় ঘৃণা থেকে। ঘৃণা এবং ভালোবাসা খুব নিকট সম্মন্ধ যুক্ত। আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা আছে কিভাবে আমরা সহজে অন্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ি যদিও আমাদের বুদ্ধিমত্তা তখনও আমাদের আবেগকে গ্রহণ করেনি। সুতরাং যখন কোন জীব পরমেশ্বরের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করে তৎক্ষণাৎ সে পরমেশ্বরের একজন প্রতিদন্দ্বীতে পরিণত হয় এবং পরমেশ্বরের ন্যায় উপভোগ করতে বাসনা করে।

এই ধরণের ভোগ বাসনা চিন্ময় জগতে বিদ্যমান থাকতে পারেনা যেহেতু সেখানে সকলেই নিজেদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপভোগ্য মনে করেন, তারা কখোনো নিজেরা ভোক্তা হতে চান না। যেহেতু ভোক্তা হিসেবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদন্দ্বী হবার বাসনা হচ্ছে চিন্ময় (কারণ চিন্ময় জগতের সমস্ত বাসনা আসে চিন্ময় স্তর থেকে যেহেতু তারা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়), সেই বাসনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়। চিন্ময় জগতের সকল ইচ্ছাই তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়, কারণ সেটি হচ্ছে চিন্ময় জগতের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যেহেতু কারও প্রভু হবার বাসনা চিন্ময় জগতে পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয় কারণ সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা এবং সেখানে তাঁর কোন প্রতিদন্দ্বী থাকতে পারেনা। তাই কেউ জড় জগতে আসে তার সেই ভোগ আকাঙ্খাপূর্ণ করার প্রচেষ্টা করার জন্য।

জড় জগত হচ্ছে একটি চমকপ্রদ স্থান, কারণ ভগবান এক বৃহৎ মায়া সৃষ্টি করেছেন যে আমরা ভগবান হতে পারি এবং তাঁর থেকে স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মতো বদ্ধ জীবের প্রতি

ভালোবাসাবশতঃ এই মায়া সৃষ্টি করেছেন। আমাদের পক্ষে এমন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এটা তুলনা করা যেতে পারে একটা ক্রীড়াঙ্গনের সাথে যা কোন পিতা তার শিশু সন্তানের জন্য তৈরি করেন। কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ এ ধরণের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে পারেন এবং তিনি তা করেন শুধু মাত্র আমাদের ন্যায় জীবাত্মাদের এই সুযোগ দেয়ার জন্য যে আমরা নিজেদের ভোক্তা মনে করে জড় জগতকে ভোগ করতে চাই। কিন্তু এই মাত্র সমস্যা যে এই তথাকথিত উপভোগ হচ্ছে মায়িক এবং তা বেশীক্ষণ চলতে পারেনা। এখানে সবকিছু ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখপূর্ণ।

তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কেন এইরকম একটি জগত সৃষ্টি করলেন যেটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখপূর্ণ? এর উত্তরটা সহজঃ কারণ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ চান না যে আমরা এখানে অবস্থান করি। তিনি চান যেন আমরা এটা উপলব্ধি করি যে, এই জড় জগতে এসে আমরা ভুল করেছি এবং আমরা যেন পুণরায় আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাই। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড়া প্রকৃতিকে নির্দেশ প্রদান করেন বদ্ধ জীবদের হতাশার দিকে চালিত করতে যাতে তারা কোনএকদিন ভগবন্মুখী হয় এবং তাঁর শরণাগত হয় যিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে তাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন । ভগবান বলেছেন, যে এভাবে তাঁর শরণাগত হয় সে শীঘ্রই তাঁর কাছে ফিরে আসে।

ভগবান বদ্ধ জীবদের সহায়তা করেন তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের তাদের নিকট প্রেরণ করে। শুদ্ধ ভক্তরা চিন্ময় জগতের জ্ঞান বদ্ধ জীবদের প্রদান করে পুণরায় তাদের প্রকৃত আলয় সম্পর্কে সচেতন করেন। ভগবান বৈদিক শাস্ত্র প্রণয়ন করে অপ্রাকৃত চিন্ময় জ্ঞানের দ্বারা তাদের চক্ষু উন্মিলিত করেন। তিনি জীবদের প্রতি এত করুণাপরায়ণ যে তিনি স্বয়ং মাঝে মাঝে চিন্ময় জগত থেকে অবতরণ করেন তাঁর অপ্রাকৃত লীলা প্রর্দশন করার উদ্দেশ্যে, যেন বদ্ধ জীবেরা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর নিত্যধামে প্রত্যার্বতন করে।

কেউ এই প্রশ্ন করতে পারে যে, " যদি আমরা আমাদের চিন্ময় অবস্থানে জ্ঞানময় হয়ে থাকি যেহেতু আমরা বলে থাকি যে চিন্ময় আত্মা নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দপূর্ণ, তাহলে আমরা এই জড় জগতকে দুঃখ ভোগের স্থান হিসেবে জেনেও কেন এখানে এসেছি? উত্তরটা সহজ। কেউ জ্ঞানে পরিপূর্ণ, একইভাবে একটি গ্লাস জল দ্বারা পূর্ণ হয়। যখন গ্লাসটি জল দ্বারা পূর্ণ হয় তখন আমরা বলি যে এটি পরিপূর্ণ। যাহোক, কেউ বলবে না যে পৃথিবীর সমস্ত জল সেই গ্লাসটিতে আছে। কেবলমাত্র সামান্য জলই সেই গ্লাসটিতে আছে। যেহেতু আমরা পরিমাণগতভাবে পরমেশ্বর থেকে ভিন্ন, আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, আমাদের জ্ঞান এবং আনন্দের পরিমাণ পরমেশ্বরের থেকে অনেক ক্ষুদ্র। যাহোক, যেহেতু আমরা হচ্ছি জ্ঞানের ক্ষুদ্র ধারক, আমরা সহজেই জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ হতে পারি আমাদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী। এটার অর্থ এই নয় যে, আমরা সমগ্র জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এর অর্থ আমাদের কেবল সেই পরিমান জ্ঞান রয়েছে যা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যথেষ্ট।

সুতরাং কোন জীব যখন ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয় সে তখন উপলব্ধি করতে পারেনা যে সে জড় জগতে পতিত হলে দুঃখ ভোগ করবে, যেমন কোন ভোগাসক্ত ব্যক্তি তার কর্মের পরিণাম বিবেচনা না করে তার ভোগাকাঙ্খা পূর্ণ করার জন্য ধাবিত হয়। কামনার দ্বারা পূর্ণ হয়ে জীব তার আদি অপ্রাকৃত জ্ঞান ভুলে যায় এবং তার বাসনা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে জড় জগতে প্রবেশ করে।

মানুষকে যথার্থ বৃত্তিযুক্ত করাই নেতার কর্তব্য

– শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরকক্ষে প্রদত্ত শ্রীমদ্ভাগবত প্রবচন থেকে সংকলিত

শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে আমরা দেখতে পাই, প্রাচীন ভারতবর্ষে দুষ্ট রাজা বেণ যখন দেশ শাসন করত, তখন তার নিষ্ঠুর অত্যাচারে জনসাধারণ বিপদগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল– একদিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন এক অপশাসনকারী রাজা এবং অন্য দিকে দস্যু-তস্কর আদির মাঝে বিপদাপন্ন জীবন। (ভাঃ৪/১৪/৮)

বৈদিক সমাজের শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা তখন সমবেতভাবে জনগণের কল্যাণে হুঙ্কার ধ্বনির সাহায্যে রাজা বেণকে সংহার করেছিলেন। (ভাঃ৪/১৪/৩৪)

বিজ্ঞ মহর্ষি এবং ব্রাহ্মণেরা তখন প্রজাদের রক্ষক রূপে পৃথু মহারাজকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

দুরাচারী রাজা বেণের অপশাসনে প্রজারা অন্নাভাবে ক্ষীণ কলেবর হয়ে, পৃথু মহারাজের কাছে এসে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করেছিল।

বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম এতই সুন্দরভাবে গঠিত যে, ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণেরা রাজাকে পরিচালনা করতেন, এবং রাজা প্রজাদের রক্ষা করতেন। ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন এবং ক্ষত্রিয়দের সংরক্ষণের বৈশ্যরা গোরক্ষা করতেন। শূদ্ররা তাদের দৈহিক শ্রমের দ্বারা তিনটি উচ্চ বর্ণকে সাহায্য করত। সেটিই হচ্ছে পরিপূর্ণ আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা।

সদ্য অভিষিক্ত রাজা পৃথুর কাছে প্রজারা এসে প্রার্থনা জানিয়েছিল, "হে রাজন! বৃক্ষের কোটরস্থ অগ্নি যেমন ধীরে ধীরে বৃক্ষটিকে শুকিয়ে ফেলে, তেমনই আমরা জঠরাগ্নির প্রভাবে শুকিয়ে যাচ্ছি। আপনি শরণাগতদের রক্ষক, এবং জীবিকা প্রদানের জন্য আপনি নিযুক্ত হয়েছেন। তাই আমরা সকলে আপনার কাছে এসেছি, যাতে আপনি আমাদের রক্ষা করেন। আপনি কেবল একজন রাজাই নন, আপনি ভগবানের অবতারও। বাস্তবিকপক্ষে, আপনি সমস্ত রাজাদের রাজা। আপনি আমাদের সর্বপ্রকার জীবিকা প্রদান করতে পারেন, কারণ আপনি আমাদের জীবিকাপতি। তাই, হে রাজাধিরাজ! দয়া করে অন্ন বিতরণ করে আপনি আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি সাধন করুন। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন, অন্যথায় অনাহারে আমাদের মৃত্যু হবে।" (ভাঃ ৪/১৭/১০-১১ অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৬৫০, ১ম ভাগ)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এখানে পৃথু মহারাজকে সকল রাজার রাজা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। সমাজে রাজার অবশ্য নির্ভরশীল প্রজামন্ডলী থাকবে এবং রাজার ওপরেই তাদের ভরসা হবে। নানা ধরনের বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সমাজে থাকবে, নানা কাজ তারা করবে, তাদের ওপরে কোনও একজনকে নেতৃত্ব দিতেই হবে, নেতাকে জানতে হবে কিভাবে সমাজের সমস্ত মানুষের কাজকর্মের সংহতি সমন্বয় সাধন করতে হয়, কিভাবে তাদের সুসংগঠিত করে চালাতে হয়, যাতে তারা সংঘবদ্ধভাবে সাফল্যের সঙ্গে সৃজনমূলক ব্রতে নিয়োজিত হতে পারে, সমাজের কল্যাণের কিছু করতে পারে।

সমাজে যখন তেমন কোনও নেতা থাকে না, সমাজে তখন অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলা জাগে এবং তার পরিণামে সকলেই কষ্ট ভোগ করে। অতএব, নেতা একজনকে থাকতেই হবে, হয়ত সে খারাপ নেতা–তবু 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামাই ভাল'।

সুতরাং বৈদিক সভ্যতা অনুসারে রাজার নেতৃত্ব অবশ্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ভগবদ্ভক্তিভাবাপন্ন সমাজে তো রাজা হলেন 'নরদেব', তিনি ভগবানের প্রতিনিধিস্থানীয়। তেমন রাজার দায়িত্ব শুধুমাত্র দেশবাসীর জড়জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করাই নয়, তাদের যথাযথভাবে ভগবানের সেবাকার্যে নিয়োজিত করে রাখার দায়িত্বও রাজার।

দেশবাসী বলতে বোঝায় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র। এদের সকলকে রক্ষা করা বলতে জাগতিকভাবে রক্ষা করার পাশাপাশি পারমার্থিক সংরক্ষণকেও বোঝায়। মানুষকে পারমার্থিক পথে সুনিশ্চিতভাবে অগ্রসর হতে সাহায্য করা এবং নিয়মিত ভগবানের নাম জপকীর্তনের উদ্বুদ্ধ করাও রাজার কর্তব্য। ক্ষত্রিয়দের সাহায্যে রাজা তাঁর ভগবদ্ভক্ত প্রজাদের সব রকম বিঘ্ন থেকে রক্ষা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন, তারা যেন ভগবানের নাম সংকীর্তন, শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং পূজা অর্চনা নিবেদনের মাধ্যমে ভগবানের প্রীতিবিধানের ব্রতে নিয়োজিত থাকে। তেমনি মন্দিরের যিনি অধ্যক্ষ, তাঁকেও সেই ভাবে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে, যাতে ভক্তমণ্ডলী ভগবদসেবায় মগ্ন হয়ে থাকতে পারে।

একথা সর্বজনবিদিত সত্য যে, অলস মস্তিষ্কের মানুষেরই অল্পবুদ্ধি থাকে। কিছু মানুষ শুধু দর্শনকথাতেই মনোনিবেশ করতে পারেন, তাঁদের সংখ্যা সমাজে অতি অল্প। ভগবদ্ভক্তির নিয়মিত অনুশীলন করলে জীব কখনও মায়াকবলিত হতে পারে না। অলস মস্তিষ্কের অধিকারী হলে কোনও কাজেই উদ্দীপনা পাওয়া যায় না। সমাজের নেতা, রাজা যাঁরা হন, তাঁদেরই কাজ সেই উদ্দীপনা জাগানো।

এখন সুনিশ্চিতভাবেই বোঝা যাচ্ছে, নেতা যিনিই হন, তাঁর কাজ হল প্রত্যেককে যথোপযুক্ত ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত করার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তিপ্রবণ করে তোলা। এর জন্য সমাজের সকল স্তরে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক যথোপযুক্ত

কর্মসংস্থান করে রাখা নেতা তথা রাজার কর্তব্য। তাতে কোনও অবহেলা হলে মানুষ অলস অকর্মণ্য শয়তান হয়ে ওঠে। মানুষ যদি উপযুক্ত ভগবদ্ভক্তিভিত্তিক কাজ না পায়, তখন তার আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয়।

তেমনই মন্দিরে সেবারত প্রত্যেকটি ভক্তেরই উচিত দাবি জানানো উপযুক্ত ভগবদ্ভক্তিভিত্তিক সেবাকার্যের জন্য। ভক্ত যা ইচ্ছা দাবিদাওয়া করতে পারে না, তাকে নম্র বিনয়ী হতে হয়, কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা বিনীতভাবে দাবি জানাতে পারি, তা হল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকার দাবি।

ভগবানের সেবার কোনও শেষ নেই, তাই মানুষের বৃত্তিও অনন্ত প্রকারের। কাজের কোনও অন্ত নেই। বরং উপযুক্ত বৃত্তির তুলনায় মানুষের আয়ু বড়ই স্বল্প। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা-সন্তুষ্টির অনুকূলে আমরা যত কিছু করতে পারি, ততখানি সময়ই আমাদের স্বল্পায়ু জীবনে দুর্লভ। আমাদের নানা কল্পনার মাঝেই আমাদের কর্মক্ষমতা আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিত্যনিয়ত কোনও না কোনও ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবায় আত্মনিয়োগ করে থাকতে হয়। নচেৎ ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত অনিয়ন্ত্রিতভাবে আমাদের যত্রতত্র বিপদগামী করে নিয়ে যায়।

প্রতিদিন সকালে প্রসাদ গ্রহণের সময়ে আমরা শুনতে পাই সেই মন্ত্র, যাতে বলা হচ্ছে-শরীর অবিদ্যাজাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল'-আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়াদি মায়াজাল কিভাবে আমাদের মৃত্যুমুখে টেনে নিয়ে চলে। তাই যদি হয়, ইন্দ্রিয়গুলি যদি নিত্য আমাদের মৃত্যুমুখী করে রাখে, তবে অধঃপতনের কবল থেকে আত্মরক্ষার কি উপায়?

একমাত্র উপায় হল ইন্দ্রিয়গুলিকে জড়জাগতিক ভোগ থেকে নিবৃত্ত করে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত রাখা, যেকথা শ্রীমদ্ভবদগীতায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে (গীতা ৩/৪১)- তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ-তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার মাধ্যমে জ্ঞান ও বিজ্ঞাননাশক, পাপের প্রতীকরূপে কামবাসনাকে বিনাশ কর। অর্জুন মহাবলশালী পুরুষ ছিলেন, সমগ্র জগতের শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, শৈশব থেকে তিনি রাজকার্য, দর্শনতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। তবু গীতার প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ইন্দ্রিয় দমনের সামান্য বৃত্তি অনুশীলনেরগুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমরা যদি ইন্দ্রিয় দমন করতে পারি, সেগুলিকে যথাযথভাবে ভগবানের সেবায় সুনিয়োজিত রাখতে পারি, তবেই পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হতে পারব। যথার্থ বৃত্তির ক্ষেত্রে আমরা সার্থকতা অর্জন করতে চাই, সমাজে সাফল্য লাভ করতে ইচ্ছা করি, আমাদের অগ্রসর হয়ে চলতে ইচ্ছা হয়, আমাদের কত রকমের পরিকল্পনা রয়েছে আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রসার করতে অভিলাষী, যে জড়জাগতিক জীবনদর্শন আজ পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করে সমাজকে ধ্বংসোন্মুখী করে তুলেছে, তাকে জয় করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের রয়েছে।

কিন্তু সমাজের জনগণকে জয় লাভ করার আগে আমাদের নিজেদের আত্মসংযমের ক্ষেত্রে জয়লাভ করা চাই। এর জন্য আমাদের হতে হবে 'গোস্বামী' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির প্রভু। অতএব তার জন্য চাই আমাদের সাধনা। যেমন, অতি প্রত্যুষে জেগে ওঠার সাধনা। এটিই হচ্ছে প্রসাদ বা কৃপা-রাগ দ্বেষ বিমুক্তৈস্ত.....প্রসাদম অধিচ্ছতি-রাগ দ্বেষ কাম প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং তা করতে হলে চাই ভগবানের কৃপা।

ভগবানই কৃপা করে আমাদের পথ প্রদর্শন করেন। নচেৎ মানুষ জানে না কিভাবে ইন্দ্রিয়গুলি সুনিয়ন্ত্রিত করে রাখা যায়। মানুষ শুধু নদীর মাঝখানে সামান্য একটি তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাচ্ছে।

'মিছে মায়ার বশে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই' অথৈ জলে হাঁকপাঁক করে মারা পড়ছে মানুষ তার ইন্দ্রিয় উপভোগের সমুদ্রে নেমে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতো মহান ভক্ত যদি নিজেকে নদীর ঢেউ-এ ভাসমান একটি তুচ্ছ তৃণখণ্ড বলে মনে করেন, তা হলে আমাদের স্থান কোথায়? তাঁর মতো শক্তিশালী ভক্তও মনে করছেন যে, জড়া প্রকৃতির গুণের ঢেউ তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তা হলে আমাদের কী অবস্থা?

আমরা সকল সময়ে বাচোবেগম মনসঃ ক্রোধবেগম জিহ্বাবেগম-এমনি নানা ধরনের ইন্দ্রিয়বেগের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে রয়েছি। জড়বাদীরা কত রকমের প্রলোভন দেখিয়ে মানুষের মধ্যে বিকৃত মনোভাবের সৃষ্টি করছে। সুতরাং নানা ধরনের চিত্তাকর্ষক জড় বিষয়াদি থেকে সরিয়ে এনে মনকে নিয়ন্ত্রিত এবং সুনিয়োজিত করতে হবে, নচেৎ এইগুলির মাধ্যমেই জড় বিষয়ী মানুষ অন্য সকলকে শোষণ করে চলবে। এই সমস্ত প্রলোভনের সাহায্যেই জড়বাদী মানুষেরা জনগণকে নেশার দিকে টানে, অবৈধ যৌন অভ্যাসে লাগায়, মাছ-মাংস ডিম খেতে শেখায়, জুয়ো খেলে সর্বস্বান্ত হতে প্রলুব্ধ করে, এমনি নানা ধরনের পাপকার্যে আকৃষ্ট করে।

তাই এই সব বিভ্রান্তির ফলে পারমার্থিক জীবনে বিঘ্ন ঘটে এবং তা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হলে সাধনায় নিয়োজিত হতে হবে। আমাদের কল্যাণের জন্যেই তার দরকার। মন্দিরের কমান্ডার আমাদের ভোরবেলা মঙ্গল আরতিতে যেতে ডাক দেন, সেটা মন্দিরের কমান্ডারের উপকারের জন্য নয়, আমাদেরই কল্যাণে। তিনি সেবাকার্যে নিয়োজিত করে আমাদেরই মঙ্গর সুনিশ্চিত করতে চান। এটাই তাঁর সেবা।

তারুণ্যে কৃষ্ণভাবনামৃতের গুরুত্ব

[Source: A lecture on " Why Accept Krishna Consciousness in Youth? " given by H. G. Gauranga Das (26th July 2002) published in " REVIVAL " by Gaur Gopala Das]

-ভাষান্তর- মীনাক্ষী রাধিকা দেবী দাসী

এখনই কেন, যখন আমরা যুবক?

আমাদের অনেকেই বলতে পারে যে, " আমরা জানি যে আমাদেরকে এই সংসার সমুদ্র পার হতে হবে এবং পারমার্থিক জগতে পৌছাতে হবে, কিন্তু এত তাড়াহুড়ো কিসের? আমাদের তো সামনে পুরো জীবনটাই পড়ে রয়েছে এবং এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো বৃদ্ধ বয়সে করা যাবে না, এই যুবক অবস্থাতেই তা সম্পন্ন করতে হবে। মুকুন্দের চরণে আশ্রয় গ্রহণ- এটা তো বৃদ্ধ বয়সেও করা যাবে। সুতরাং আমাদেরকে উভয় জগতের সবচেয়ে ভালো অবস্থাটা পেতে দিন - প্রথমে আমাদের ভোগ করতে দিন, সবকিছু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে দিন, তারপর এই উপলব্ধিগুলো নিয়ে ৬০-৭০ বছর বয়সে আমরা মুকুন্দের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করবো। এখন নয়। আমাদেরকে হরেকৃষ্ণ জপ করতে বলবেন না, আমাদেরকে সাধু সঙ্গে আসতে বলবেন না - সৎসঙ্গ - যা বলতে মূলতঃ বৃদ্ধদের কাজকেই বোঝায়। আমরা যুবক নেতা। আমাদের দেহে শক্তি আছে আমরা জীবনে কিছু করার জন্য উৎসাহিত। যদি আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করি, তবে জীবনের সকল উচ্চাকাঙ্খা হারিয়ে ফেলবো। কাজেই এখনই আমরা এটি গ্রহণ করবো না, যখন সঠিক সময় আসবে তখন গ্রহণ করবো।" এভাবে বিভিন্ন ধরনের যুক্তির অবতারনা করা হয় যৌবনাবস্থায় কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ না করার পক্ষে।

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমতঃ মূল বিষয়টি হচ্ছে- কে যুবক আর কে বৃদ্ধ? যৌবন আর বার্ধক্যের সংজ্ঞাটা কি? আমাদের কিছু নমুনা উত্তর নিম্নে দেয়া হলোঃ

"যখন আমি অনেক দূর হাঁটতে পারি না তখন আমি বৃদ্ধ।" এখানে অনেক যুবক আছেন যারা খোঁড়া- যাদের কোন পা-ই নেই। সুতরাং তারা বৃদ্ধ?

" যখন আমি সঠিকভাবে খাদ্য চিবোতে পারি না তখন আমি বৃদ্ধ: যখন আমার দাঁত পড়ে যায় তখন আমি বৃদ্ধ।"

এখন এমন কিছু লোকের সাথে সাক্ষাৎ হতে পারে যারা ১৫ বছর বয়সে কোন দূর্ঘটনায় তাদের সব দাঁত হারিয়েছে তাহলে কি তারা ১৫ বছর বয়সেই বৃদ্ধ হয়ে গেছে?

"যখন আমি যথাযথভাবে খাদ্য হজম করতে পারি না তখন আমি বৃদ্ধ।" তাহলে একজন যুবক যদি বদহজম রোগে ভোগে তবে কি সে বৃদ্ধ?

"যখন আমার জীবনের সমস্ত চাহিদা গুলো মিটে যাবে তখন আমি বৃদ্ধ হব। এর পূর্ব পর্যন্ত আমি বৃদ্ধ নই। আমরা ৮০ বছরের কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে, সে কি তার জীবনের সকল আশা পূরণ করতে পেরেছে? যদি সে বলে- না ! তখন কি এটা বোঝাবে যে, সে যুবক?

"যখন আমার চুল পড়ে যাবে তখন আমি বৃদ্ধ।" অথবা "যখন আমার চুল বাদামী বর্ণ ধারণ করবে তখন আমি বৃদ্ধ হব।" কিন্তু আমরা এ ধরনের লোকও খুঁজে পাই ৩০-৪০ বছরের যাদের বাদামী রঙের চুল রয়েছে। আবার ৬০-৬৫ বছরের এমন লোকও আছে যাদের চুল পিচের মতো কালো। অতএব, কারো চুল যদি বাদামী রঙের হয় এবং সে যদি রঙ দিয়ে তার চুল কালো করে তাহলে কি সে যুবক হয়ে গেল?

কে বৃদ্ধ আর কে যুবক?

কে বৃদ্ধ আর কে যুবক?- এর প্রেক্ষিতে আমরা অনেক ধরণের বর্ণনা খুঁজে পাই। এটা বলাই যথেষ্ট যে পারমার্থিক দিক থেকে একটি মাত্র বোঝাপড়া আছে- সেটি হচ্ছে মৃত্যুর নৈকট্য কতটুকু? বিস্তৃতভাবে বললে- যে মৃত্যুর কাছাকাছি তাকে বৃদ্ধ বলা হয় আর যে মৃত্যু থেকে অনেক দূরে আছে তাকে বলা হয় যুবক। তাহলে এখানে একজন ৮০ বছরের লোক থাকতে পারে যে আরো ২০ বছর বাঁচতে পারে এবং ১৫ বছরের একটি বালক আছে যে আগামী কালই মরে যেতে পারে। এখন তাহলে কে যুবক? ৮০ বছরের লোকটি কারণ তার আরো ২০ বছর আছে বেঁচে থাকার । নাকি ১৫ বছরের ছেলেটি যে কালকেই মরতে চলেছে? সুতরাং মৃত্যুর নৈকট্যই নির্ধারণ করে দেয় কে বৃদ্ধ আর কে যুবক" এই যে যুক্তিটা যে- আমার হাতে এখনো অনেক সময় আছে- পারমার্থিক দর্শনানুপাতের চিত্রাঙ্কে এর দাঁড়ানোর কোন স্থান নেই। কারন মৃত্যু যে কোন সময় আসতে পারে। এক্ষেত্রে কিছু মজার দৃষ্টান্ত- আমরা দেখতে পাইঃ

দৃষ্টান্ত ১ঃ খুব ভালো ডাক্তার হওয়ার উচ্চাকাঙ্খা সম্পন্ন একটি ছেলে ছিল যে MBBS কোর্সের তৃতীয় বর্ষে পড়তো। সে প্রায়ই ISKCON -এর স্থানীয়

প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতো। একবার কোন এক মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ক্যাম্পাস এর কোন এক জায়গায় " Dandiya rasa " নামক নাচের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ভরপেট খাওয়া-দাওয়া করার পর ছেলেটির নিকট একটি পছন্দের ব্যাপার আসল। সে কি ISKCON -এর প্রোগ্রামে যাবে না "Dandiya rasa" প্রোগ্রামে যোগ দিবে। তার এক বন্ধু বলল- "সেখানে যেওনা, চল আমরা "Dandiya" তে যাই।" ছেলেটি বলল- না! না! ISKCON -এর প্রোগ্রামে আমি নিয়মিতই যাচ্ছি কাজেই আমি তোমার সাথে যেতে পারব না। তার বন্ধুটি জিজ্ঞেস করল- ISKCON -এর প্রোগ্রামে কি মেয়েরাও আসে? না ! শুধুমাত্র ছেলেরা! তারা তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করে বলল, "তাহলে ISKCON -এর প্রোগ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা কি? "

শেষ পর্যন্ত সে তার বন্ধুদের সাথে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল এটা না জেনে যে - সেখানে তার জন্য কি চরম দূর্ঘটনা অপেক্ষা করছে। সে তার বন্ধুদের সাথে নাচতে আরম্ভ করল এবং তা উপভোগ করতে লাগল হঠাৎ করে দু'ঘন্টা নাচার পর তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল এবং সে ভূ-পতিত হলো। তার সহপাঠীরা তাকে জরুরী বিভাগে নিয়ে গেল এবং আধ ঘন্টার মধ্যে সে মৃত ঘোষিত হলো। কারণ ছিল ২২ বছর বয়সের গুরুতর হার্ট এ্যাটাক। যখন খবরটা আমাদের কাছে আসল তখন আমরা দুঃখ প্রকাশ করলাম এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানালাম। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে আমরা যে কোন বয়সেরই হতে পারি এবং মৃত্যুও যে কোন সময়ই আসতে পারে।

দৃষ্টান্ত- ২ঃ- একজন ব্যক্তির একটি মেয়ে ছিল। মেয়ের জন্মের ১০ বছর পর লোকটির খুব সুন্দর ফুটফুটে একটি ছেলে হলো। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছেলেটির প্রতি খুব আকৃষ্ট হলেন। ছেলেটির বয়স যখন প্রায় ১ বছর হলো তখন তার বাবা তার প্রথম জন্মদিন পালনের জন্য আয়োজন করতে লাগলেন। একদিন বাচ্চাটি তার ঠাকুরমার কোলে উঠে ছিল যিনি রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। বাচ্চাটি শেলফের দিকে মুখ ফিরানো ছিল। হঠাৎ করে বাচ্চাটি শেলফের মধ্যে রাখা প্রেসার কুকারের ওয়েটটি (Weight) হাত বাড়িয়ে নিয়ে তার মুখে পুরে দিল। তার ঠাকুরমা দেখল যে ওয়েটটি বাচ্চাটির মুখের মধ্যে চলে যাচ্ছে। তিনি তার হাত ধরতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। ইতোমধ্যেই সে এটি গিলে ফেলেছে। এটি তার গলায় প্রবেশ করে তার শ্বাস বন্ধ করে ফেলল। বাচ্চাটির বাবা স্নান করছিলেন। তার ফিরে আসার আগেই কয়েকজন প্রতিবেশী বাচ্চাটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। কিন্তু হাসপাতালে নেয়ার সময়ের মধ্যেই বাচ্চাটি মারা গেল। একটি এক বছরের ছোট্ট বালক আর একটি ছোট দূর্ঘটনা। যে কোন সময় যে কোন কিছু ঘটতে পারে। সুতরাং; উপরি উক্ত আলোচনা প্রহ্লাদ মহারাজের সেই চিরন্তন বাণীরই যথার্থতা প্রমাণ করে যে - "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞ"– অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাল্যকাল থেকেই কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করেন।

(১৩ পৃষ্টার পর- কলিযুগের ভণ্ড অবতার)

এই সমস্ত অভিনব অবতারদের সম্বন্ধে খুব ব্যাপক ভাবে প্রচারের চেষ্টাও চলিতেছে। সভাসমিতিতে বক্তৃতায় এবং পুস্তক পুস্তিকাদি প্রচারের দ্বারা। প্রচারের ফলে অনেক সময়ে এবং অনেক স্থলে সত্যও মিথ্যায় এবং মিথ্যাও সত্যে পর্যবসিত হইতে পারে। কোন কোন অভিণব অবতারের উপাসনা মন্ত্রেরও সৃষ্টি হইতেছে এবং ভগবৎ-নাম কীর্তনের পরিবর্তে কোন কোন অভিণব অবতারের নাম কীর্তন ও প্রবর্তিত হইতেছে।

"যেই মূঢ় কহে, জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।?
সেইত পাষণ্ডি হয়, দণ্ডে তারে যম॥?

(চৈঃ চঃ ২/১৮/১১৫)

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম রুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বৈনব বীক্ষেত স পাষণ্ডি ভবেৎ ধ্রুবং॥

(পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ যে ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবতাগণের সহিত শ্রীনারায়ণ সমান এরূপ মনে করেন সেই লোক নিশ্চয় পাষণ্ডি।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ থেকেও আমরা দেখি, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর উল্লেখ করেছেন– কিভাবে সাধারণ মানুষ নিজেকে ভগবান বলে প্রচার করে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত আছে–

"মধ্যে মধ্যে মাত্র কোন পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর ভরন লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ বলি আপনাকে কেহ বলে॥
কোন পাপী সব ছাড়ি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় কত বা ভুতগণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন লাজে আপনাকে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র কচ মনে কাচে॥
সে পাপীষ্ঠ আপনারে বোলায়ে গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল॥

এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তথাকথিত ভণ্ড ভগবান সম্পর্কে প্রত্যভৎর্সনামূলক বাক্য। আমরা দেখতে পাই, সেই সময়েও মানুষ নিজেকে রঘুনাথ, গোপাল বলে সমাজের লোকদের প্রতারণা করত। প্রচারকদের বাকচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে, অভিনব অবতারদের উপসনায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন, পারমার্থিক দিক দিয়া তারা প্রতারিত হচ্ছেন কিনা, তা সুধীগণের বিচার্য বিষয়।"

জাত গোস্বামী/গোঁসাই সম্প্রদায়

এই বইতে প্রকৃত গোস্বামীদেরকে নিন্দাবাদ করা হয় নাই একথা পাঠকদেরকে স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু গোস্বামী পদবী ধারণ করে বৈষ্ণব ধর্মের বিরুদ্ধ বিভিন্ন অনাচারে যারা লিপ্ত তাদের ব্যাপারেই এক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে।

—শ্রী মনোরঞ্জন দে

গোস্বামী শব্দটিকে যারা একটি নিছক উপাধি বলে মনে করেন তাদেরকে জাত গোস্বামী বা গোঁসাইবাদী বলা যায়। গো শব্দের এক অর্থ হল ইন্দ্রিয়। স্বামী শব্দের অর্থ হল প্রভু বা নিয়ন্ত্রক। তাই গোস্বামী পদবাচ্যে তারাই ভূষিত হতে পারেন জড়-ইন্দ্রিয় সকলের উপর যাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের উপর নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিগণই গোস্বামী পদবী ধারনের উপযুক্ত। নিছক বংশ পরম্পরায় গোস্বামী উপাধি ধারণ করা শাস্ত্রসম্মত নয় বলা যায়।

জাত গোস্বামী বা গোঁসাইরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মূলতঃ মন্ত্র ব্যবসায়ী হন। নিজেদের গোস্বামী-বংশীয় বলে পরিচয় দেন। নিজেরা বংশ ধারায় গুরু পরম্পরা বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। এরা কিছু কিছু বৈষ্ণব সদাচার নিজেদের সুবিধামত পালন করেন এবং শিষ্যদেরকেও পালনের উপদেশ দেন। পাত্র-পাত্রী বিচার না করে নির্বিচারে মন্ত্র দীক্ষা দিয়ে শিষ্য করেন। অনেক সময় শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ এবং কীর্ত্তন করে অর্থ উপার্জন করেন। এদের মধ্যে অনেকে বাহ্যত বৈষ্ণব বেশ ধারণ করলেও মনে-প্রাণে স্মার্ত্তবাদী হয়।

তথাকথিত গোসাই/গোস্বামীদের মধ্যে একদল আছেন যারা নিজেদেরকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলে দাবী করেন। তারা বলেন গুরুই স্বয়ং কৃষ্ণ। এরা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত সহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ থেকে পাঠ করে শিষ্যদের মাঝে এরূপ বদ্ধমূল ধারণা ঢুকিয়ে দেন যে যেনতেন ভাবে গুরু হলেও তিনি কৃষ্ণ। অর্থাৎ গুরুমাত্রই কৃষ্ণ। তাই তিনি কোন ধর্মীয় নিয়ম বা নিষ্ঠাচারের অধীন নন। যে কোন শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের উর্দ্ধে। কারণ—

১. **গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।**
গুরুদেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ॥

২. **যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।**
তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রামানে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

(চৈ.চ.আদি ১/৪৪-৪৫)

৩. **শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।**
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ-এই দুই রূপ॥

(চৈ.চ.আদি ১/৪৭)

৪. **আচার্য্যং মাং বিজানীয়ন্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।**
ন মর্ত্ত্যাবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময় গুরুঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/১৭/২৭)

অর্থাৎ- ভগবান উদ্ভবকে বললেন, "হে উদ্ধব! গুরুদেবকে আমার স্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্য বুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না। গুরু সর্বদেবময়।"

উপরোক্ত সব শ্লোকের অর্থ সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য যদি সদ্‌গুরু হন। তাহলে সদগুরুর লক্ষণ কি? শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর উপদেশামৃত গ্রন্থে বলেছেন—

"বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

(উপদেশামৃত ১ম শ্লোক)।

—অর্থাৎ বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোদের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের (লিঙ্গ) বেগ—এই ছয়টি যে ব্যক্তি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করতে পারেন—অর্থাৎ তিনিই ষড়বেগজয়ী গোস্বামী।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মন্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

(শ্রীমদ্ ভাগবত ১১/৩/২১)

—অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয় অবগত হওয়ার জন্য সদগুরুকে আশ্রয় করবেন। যিনি শব্দব্রহ্মে—অর্থাৎ শ্রুতি শাস্ত্রাদি সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত-অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি (ভগবৎ অনুভূতি) লাভ করেছেন এবং তার জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নন, তিনিই সদ্‌গুরু।

কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ
নিস্পৃহঃ সর্ব্বত সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদঃ॥
সর্ব্বসংশয় সংছেত্তাহনলসো গুরুরাহৃতঃ॥"
(শ্রীহরিভক্তি বিলাস ১/৩৫ শ্লোকধৃত বিষ্ণু স্মৃতি-বচন)।

–অর্থাৎ অপার কৃপাময় (অর্থাৎ যিনি স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলে যাঁর কোন অভাব নেই), সর্বগুণে গুণান্বিত, সর্বজীবের হিতসাধনে রত, নিস্কাম, সর্বপ্রকার সিদ্ধ, সর্ববিদ্যা-অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তি সিদ্ধান্তে নিপুণ এবং শিষ্যের সবধরনের সংশয় নিরসনে সমর্থ এবং অনলস–অর্থাৎ সবসময় হরি সেবানিষ্ঠ–এরূপ পুরুষই গুরু বলে কথিত হন।

কিন্তু জাত গোসাই বা জাত-গোস্বামী পদবীধারী ব্যক্তিগণ গুরু মাহাত্ম্য খুব করে বর্ণনা করলেও নিজেদের গুণাগুন কিরূপ হওয়া উচিত তা কিন্তু কখনো শিষ্য-শিষ্যা বা অপর কারো কাছে প্রকাশ বা বর্ণনা করেন না। তাহলে যে গুরুগিরি টিকবে না।

নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে কিছু গুরু পদবীধারী আবার প্রচার করেন কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের লোকেরাই-বিশেষত ব্রাহ্মণ এবং গোস্বামী পদবীধারী ব্যক্তিরাই গুরু হতে পারেন। এর সপক্ষে কেউ কেউ মনুসংহিতার নিম্নোক্ত শ্লোকের উদ্ধৃতি দেন–

"উপনীয়ত্তু যঃ শিষ্যং বেদ মধ্যাপয়ে দ্বিজঃ।
সংকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্য প্রচক্ষেতে॥"

(মনুসংহিতা ২/১৪০)।

–অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনয়ন প্রদান করে যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষদের সাথে সমগ্রবেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করান মুনিগণ তাঁকে আচার্য্য নামে অভিহিত করেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত যে বর্ণের এবং যে উপাধিধারীই হন না কেন– তিনিই সদ্‌গুরু হওয়ার যোগ্য।

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শুদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥

(চৈ.চ.মধ্য ৮/১২৭)

শ্রীগুরু প্রাকৃত জাতিকূলের অন্তর্গত মর্ত্যজীব নন–
ষটকর্মানিপুনো বিপ্র মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুণ স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥
(শ্রীহরি ভক্তি বিলাসধৃত পাদ্মবচন)

- অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপণ, দান, ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কর্মে নিপুণ এবং মন্ত্রতন্ত্র বিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও গুরু হইতে পারেন না। কিন্তু চন্ডালকুলে জন্ম নিয়েও বিষ্ণু পরায়ণ বৈষ্ণব গুরু হওয়ার যোগ্য।

"বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশাশ্চ গুরুবঃ শূদ্রজন্মানাম্ ।
শুদ্রাশ্চ গুরুবস্তেষাং এয়ানাং ভগবৎ প্রিয়াঃ"

(পদ্মপুরাণ)

-অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিগণের গুরু হইতে পারেন–ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু ভগবৎ প্রিয়–অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শূদ্রকূলে অবতীর্ণ হলেও উক্ত তিনবর্ণের–অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কূলে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিগণের গুরু হরে পারেন।

বিভিন্ন শাস্ত্রের উপরোক্ত শ্লোকগুলি থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে একমাত্র বিষ্ণুর অনুগত–অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত লোকই সদগুরু হওয়ার যোগ্য। তাই একশ্রেণীর গোঁসাই পদবীধারী লোকেরা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পদবীধারী ব্যক্তিই গুরু হতে পারেন বলে যে প্রচার করেন–তা অসার এবং শাস্ত্রবিরোধী বলা যায়।

গোস্বামী/গোঁসাই পদবী ধারণকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেককেই দেখা যায় নিজেরা যা আচরণ করেন তা প্রচার করেন না। আবার যা প্রচার করেন নিজেরা ব্যক্তি জীবনে তা পালন বা আচরণ করেন না। অর্থাৎ নিজের সুবিধা অনুযায়ী ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। আবার নিজেই তা পালন করেন না। অথচ সদগুরুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল **"আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখায়"**। নিজে না করলে ধর্ম অপরকে শিখানো যায় না। বায়ু পুরাণে আছে–

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থপিয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচ্যর্য্য স্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

–অর্থাৎ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে সংগ্রহ করে অপরকে আচরণে স্থাপন এবং নিজে শাস্ত্রের আদেশ আচরণ করেন বলে আচারবান তত্ত্ববিৎ পুরুষ আচার্য্য নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন–

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
স যৎ প্রমানং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

–অর্থাৎ যারা শ্রেষ্ঠ লোক তারা যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাদের অনুকরণ করেন। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতে অনুবর্তী হয়॥

(চলবে)

আমি কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হলাম

সাত্ত্বিক তখন আমাকে কৃষ্ণকথা প্রচার করতে শুরু করে। কী প্রচণ্ড ক্ষুরধার তার যুক্তি! আমিও যথাসাধ্য ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে তার যুক্তিকে খণ্ডন করতে চাইলাম। অবশেষে আমি আর পালাবার পথ পেলাম না। তর্ক যুদ্ধে সাত্ত্বিকের কাছে হার মানতে হল আমাকে।

–শ্রী উত্তমশ্লোক দাস

পূর্বাশ্রমে আমার নাম ছিল লুসিয়ানো মেনেগাজ্জো। বাবার নাম গিওবন্নি এবং মার নাম গসপেরিনা। ইতালীর পাদুয়া নামক স্থানে ১৯৫১ সালের ৩ ডিসেম্বর আমার জন্ম হয়েছিল। আমার যখন মাত্র তিন বছর বয়স, তখন আমার মা দেহত্যাগ করেন। ফলে আমার শৈশব কেটেছিল খুব দুঃখের মধ্যে। অবশ্য বাবা আমাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করতেন। তবে তিনি ছিলেন ব্যস্ত মানুষ। তাঁর জীবিকা ছিল গাড়ি চালানো। অধিকাংশ সময় তিনি গাড়ি চালাতেন বলে আমরা খুব কমই তাঁর সঙ্গ পেতাম। অবশেষে তিনি আমাকে খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী পরিচালিত একটি মিশনারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। সব সময় আমি স্কুলের হোস্টেলেই থাকতাম।

হোস্টেলে সব ছাত্ররা প্রভু যিশুর কাছে প্রার্থনা করতাম। আমি ছিলাম সেখানকার প্রধান পাদ্রীর সেবক। যিশুর আরাধনায় যখন যা কিছু প্রয়োজন, সবই আমি পাদ্রীকে যোগান দিতাম। এইভাবে যিশুকে সেবা করে আমি আমার শৈশবের দুঃখকে ভুলে থাকতাম।

১৫ বছর বয়সে, আমি আমার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে, হঠাৎ একদিন গৃহত্যাগ করলাম। সেই সময় হিপিদের দলে যোগ দিয়ে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ২৩ বছর বয়স পর্যন্ত আমি শুধু এভাবে ঘুরেই বেড়াতে লাগলাম। শান্তির সন্ধানে সত্যের সন্ধানে অনেক ঘুরলাম। কিন্তু কোথাও শান্তি পেলাম না, সত্যের সন্ধান পেলাম না।

অবশেষে, আমি কিছুদিন ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিই। ২৩ থেকে ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যবসার মাধ্যমে কিছু অর্থ উপার্জন করি।

১৯৭৪ সালে আমার ছোট ভাই ভারতে চলে আসে। পরে খবর পাই যে, সে শ্রীমায়াপুরে এসে ইস্‌কনে যোগদান করেছে। ৬ বছর পর, ভাইকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি কলকাতা হয়ে শ্রীধাম মায়াপুরে এসে পৌঁছাই ১৯৮০ সালের গৌর পূর্ণিমার সময়।

শ্রীমায়াপুর এসে জানতে পারলাম যে, আমার ভাই-এর নতুন নাম হয়েছে সাত্ত্বিক প্রভু। আমি তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ছয় বছর আগে ইতালি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তাকে দেখেছিলাম একটি অর্ধ উন্মাদ নিষ্প্রভ যুবকরূপে। আর আজ এই ছয় বছরের মধ্যে কী বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তার মধ্যে। সে এখন অনেক সংহত। মুখ থেকে এক দিব্য আভা নিঃসৃত হচ্ছে যেন। মুহূর্তের মধ্যে আমি বুঝেছিলাম, আমার ভাই এখন প্রকৃত শান্তির সন্ধান পেয়েছে।

সাত্ত্বিক তখন আমাকে কৃষ্ণকথা প্রচার করতে শুরু করে। কী প্রচণ্ড ক্ষুরধার তার যুক্তি! আমিও যথাসাধ্য ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে তার যুক্তিকে খণ্ডন করতে চাইলাম। অবশেষে আমি আর পালাবার পথ পেলাম না। তর্ক যুদ্ধে সাত্ত্বিকের কাছে হার মানতে হল আমাকে।

ক্রমে ক্রমে সাত্ত্বিক-এর সঙ্গে আলোচনায় আমি বুঝতে পারলাম, নিয়ম শৃঙ্খলা ছাড়া ভগবদুপলব্ধি দুর্লভ। হিপ্পি জীবনে যদিও শান্তি ও সত্যের সন্ধানে অনেক মাথা খুঁড়েছি, কিন্তু তখন কোনও নিয়ম শৃঙ্খলার বাঁধন আমি স্বীকার করতে চাইনি। তাই হিপ্পি জীবন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কিন্তু এই সব কৃষ্ণভক্তরা কোনও নেশা করছে না, অবৈধ যৌন জীবন থেকে মুক্ত, মাছ, মাংস খায় না এবং জুয়া খেলা বর্জন করেছে। সর্বোপরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন তাদের হৃদয়কে পবিত্র করছে।

সুতরাং সাত্ত্বিককে পুনরায় জঘন্য জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা একেবারেই অনুচিত হবে। বরং আমি এখানে কিছুদিন থেকে দেখি এই হরেকৃষ্ণ জীবন ধারায় কোনও গলদ ধরা পড়ে কি না।

তারপর শ্রীমায়াপুর থেকে আমি চলে যাই শ্রীবৃন্দাবনে। সেখানে এক সপ্তাহের মধ্যে আমি আমার মস্তক মুণ্ডন করি। সেখান থেকে আবার চলে আসি মায়াপুর। আট মাস গ্রন্থ বিতরণ বিভাগে সেবা করি। ১৯৮০ সালের জন্মাষ্টমীর দু-চার দিন পরে আমার দীক্ষা হয়েছিল, নাম হয় উত্তমশ্লোক দাস।

অবশেষে চলে আসি মাদ্রাজ। কিছুদিন মাদ্রাজ মন্দিরের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে সেবা করি। পরে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত মাদ্রাজ মন্দিরের প্রেসিডেন্ট রূপে নিযুক্ত হই। ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল-এর মধ্যে প্রায় আট মাস হায়দ্রাবাদ কৃষিখামারের দায়িত্ব নিই। তারপর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পাঁচ বছর সংকীর্তন সেবা করি এবং কিছুদিন গোবিন্দ রেস্টুরেন্টের দায়িত্বে থাকি। অবশেষে ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত শ্রীমায়াপুরের গুরুকুলে সেবা করি। ১৯৯৪ থেকে এখন পর্যন্ত আমি শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি সেবায় নিযুক্ত আছি। প্রথম দিকে সমাধি নির্মাণে এবং এখন সমাধি পরিচালনায় শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করার চেষ্টা করছি।

শ্রীল প্রভুপাদকে সন্তুষ্ট করে, ভক্তি জীবনে উন্নত হয়ে অবশেষে এই জড় জগতের বন্ধন অতিক্রম করে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনই এখন আমার জীবনের লক্ষ্য।

(সাক্ষাৎকার ঃ প্রেমাঞ্জন দাস)

যত নগরাদী গ্রাম

নামহট্ট মন্দির উদ্বোধন ও শ্রীশ্রী গৌরনিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

শ্রীমননিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক শ্রীধাম নবদ্বীপের গদ্রুম দ্বীপের প্রতিষ্ঠা করেন (নামহট্ট) হরেকৃষ্ণ নামহট্ট শ্রী চৈতন্যমহাপ্রভুর আজ্ঞাকে প্রতিটি জীবের দ্বারে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই নামহট্ট। নিত্যনন্দ প্রভুর কৃপা লাভের আশায় বিকাশ ঘটিয়ে চলছে শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘের স্থানীয় ভক্তবৃন্দের মাধ্যমে সম্প্রতি যশোর জেলাস্থ ভরভাগ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রী গৌরনিতাই মন্দির ও গৌর নিতাই শ্রী বিগ্রহদ্বয়। দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের পৌহিত্ব করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ইসকনের অন্যতম সন্ন্যাসী শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ প্রেমস্বামী মহারাজ, ইসকন বাংলাদেশ শাখার সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, ইসকনের সাবেক সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ কির্ত্তন দাস ব্রহ্মচারী, ইসকন বাংলাদেশ শাখার যুগ্ম সম্পাদক শ্রী জগৎ গুরু গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী। ঢাকা মন্দিরের প্রধান পূজারী শ্রী মাধব মুরারী দাস ব্রহ্মচারী, আরো উপস্থিত ছিলেন ডাঃ তপ চৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, পুষ্প শিলাশ্যাম দাস ব্রহ্মচারী, মুক্তিদায়ী নিতাই দাস ব্রহ্মচারী, শুভনিতাই দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী ভদ্রনিমাই দাস ব্রহ্মচারী, নিতাই দয়াল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী বিহারী কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ। শ্রী গৌর নিতাইর শ্রী বিগ্রহের মহাভিষেকের মাধ্যমে গৌর নিতাইর শ্রী বিগ্রহদ্বারকে আহবান করা হয় শ্রী মন্দিরে। ঘৃত প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে মন্দিরের দরজা উৎমুক্ত করে উজ্জল জ্যোতিষের মতো মন্দিরের সিংহাসনে শোভা বর্ধন করেন শ্রীশ্রী গৌর নিতাই শ্রী বিগ্রহ দ্বয়। দুইদিন ব্যাপী এ অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিলো যজ্ঞাদি প্রজ্জলন গৌর নিতাইর মহাভিষেক, ধর্মীয় আলোচনা সভা পদাবলী কীর্তন ভজন কীর্তন।

শ্রীশ্রী রাধাগোপীনাথ মন্দির ও শ্রীবিগ্রহের ৩য়তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

ঠাকুরগাঁও,গড়েয়া, শ্রীশ্রী রাধা গোপীনাথ মন্দির ও শ্রীবিগ্রহের ৩য় বার্ষিকী উপলক্ষ্যে- গত ১ ও ২ ফেব্রুয়ারী-২০০৯ইং তারিখে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মহাসমারোহে উৎসব উদযাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীবিগ্রহের মহাঅভিষেক, বিশ্ব শান্তি কল্পে বৈদিক হোম যজ্ঞ, পদাবলী কীর্তন, বৈদিক নাটক, বৈদিক চলচ্চিত্র, ভজন কীর্তন, কুইজ প্রতিযোগীতা এবং পরিশেষে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উৎসব উপলক্ষে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগমে উৎসবপ্রাঙ্গণ মুখরিত হয়েছিল। সংবাদ দাতাঃ শ্রী কংস হন্ত দাস ব্রহ্মচারী।

সারা দেশব্যাপী জাগ্রত ছাত্র গীতা কোর্স, সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন) বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয় স্বামীবাগ মন্দিরে ২৫, ২৬ ও ২৭ শে জানুয়ারী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তিনদিন ব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠান মালার আয়োজন করা হয়। ২৫শে জানুয়ারী'০৯, রোজ রবিবার অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল স্কুল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকবৃন্দের নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে সেমিনার, সেমিনারে মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসকন ও জি.বি.সি. বর্গের অন্যমত শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ (শ্রীধাম মায়াপুর)। অন্যান্য আলোচকবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমান বেনুধারী দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীধাম মায়াপুর), শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী (সাধারণ সম্পাদক ইস্কন বাংলাদেশ) এছাড়াও স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত ভজন কীর্তন, বৈদিক নাটিকা, টক শো, বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও মহাপ্রসাদ বিতরণ। ২৬ শে জানুয়ারী'০৯ মঙ্গলবার গীতা কোর্স সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান মালার মধ্যে ছিল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, (পরিবেশন করেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ), ডাকযোগে গীতা কোর্স, গীতা স্টাডি ও গীতা সারতত্ত্ব কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা ভজন কীর্তন (পরিবেশনায় প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক কীর্তনীয়া শ্রীমান শচী কুমার দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীধাম মায়াপুর) আরতি কীর্তন বৈদিক নৃত্য, বৈদিক নাটিকা, বিজয়ীদের মাঝে সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ (পুরস্কার বিতরণ করেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ), এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ। এছাড়াও ইসকন সেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সেমিনার প্রদান করেন শ্রীমান বেনুধারী দাস ব্রহ্মচারী, (শ্রীধাম-মায়াপুর)।

সংবাদ দাতাঃ দ্বিজমনি গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী

বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজ রক্ষার জন্য দরকার ধর্মতত্ত্বের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও বাস্তবোচিত উদ্যোগ

– শ্রী অশ্বিনী কুমার সরকার, পৌরহিত্য, স্মৃতিতীর্থ (প্রথম বিভাগ)

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ভারতের কোন কোন মন্দিরের বহির্দেয়ালে এজন্যই যৌনক্রিয়ারত মিথুনমূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। খাজুরাহের শিবমন্দির তার মধ্যে অন্যতম। স্থাপত্যেশিল্পে মিথুন মূর্তির উৎকর্ষতা থাকলেও দেবস্থানে এমন নগ্নস্থাপত্য যে নিঃসন্দেহে আপত্তিকর ও কুরুচিপূর্ণ, তা আর বিশেষ ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। মদ্য-মাংস-যৌনতা কি ধর্মের শালীন, শোভন কিংবা অহিংসনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে গণ্য করা যায়? ধর্মে তো কুরিপু দমন ও কুখাদ্য পরিহারের কথা বার বার বলা হয়েছে, সংযমের কথা বলা হয়েছে। ধর্মের পালনীয় রীতি-নীতি তাই হওয়া উচিত শালীন, শোভন এবং যুগোপযোগী। যা ইচ্ছা তা ধর্মের বিষয় বলে গণ্য করা সমীচীন হতে পারে না। তা করা হলে কেবল অহেতুক সমালোচনা বিস্তৃত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না; অন্যেরা কুৎসা রটানোর একটা সুযোগ পেয়ে যায়। অন্যদের এ সুযোগ দেয়া কি সমীচীন? ধর্মের নামে সমাজের ভেতর এ ধরনের অশোভনতা, মতভেদ কিংবা বিভক্তি প্রশ্রয় পেলে সমাজের ঐক্যের ভিত্তি মজবুত হওয়া কি কোনভাবে সম্ভব হবে ? বেদ তো বস্তুত একটিই। আর তন্ত্রকে কি বেদের বাইরের কোন শাস্ত্র বলে গণ্য করা যায়? এর রচনাকাল কি বেদের পরে নয়? তন্ত্রকে বেদ থেকে আলাদা করে দেখানো কি ঠিক হচ্ছে ? পূর্বে বেদ অখণ্ডই ছিল। ঋষি পরাশর ও সত্যবতীর পুত্র মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মানবজাতির বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতা লক্ষ্য করে সেই এক বেদকেই চার ভাগে বিভক্ত করেন – তার ভাব, ভাষা, ছন্দ, অর্থ, সূত্র ও বিষয়বস্তু অনুসারে। এই চার ভাগের নামকরণ করেন তিনি – ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদ নামে। এরপর তিনি পুরাণ এবং মহাভারতাদি বিবিধ মূল্যবান গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। বেদবিভাজন ও পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনার পর তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদেরকে তা পাঠ করে শোনান। তারপর তিনি ঋষি পৈল, জৈমিনী, বৈশম্পায়ন, সুমন্ত ও শুকদেবের ওপর তা প্রচার ও বিচার-বিশ্লেষণের দয়িত্ব অর্পণ করেন। এ ভাবেই বেদ ও পুরাণভাষ্যাদি মানব সমাজে প্রচারিত হয় এবং এর ধারাবাহিকতায় তন্ত্রেরও উদ্ভব ঘটে। অধিকন্তু তন্ত্র তো বিজ্ঞানের বিষয় বলেও গণ্য হতে পারে। যেমন শল্যতন্ত্র। আসলে তন্ত্র বলতে বোঝায় কোন বিষয়ের ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সুযুক্তিপূর্ণ সুসামঞ্জস্য তথ্যনিরূপণ। সুতরাং পদার্থ বিজ্ঞানের সাথেও 'তন্ত্র' কথাটি সংশ্লিষ্ট। এজন্যই শক্তিবাদ তন্ত্রের বিষয়। পদার্থ বস্তুত শক্তিরই এক ঘনীভূত রূপ। উল্লেখ্য, অবস্থা বিশেষে পদার্থ শক্তিতে এবং শক্তি পদার্থে পরিণত হতে পারে। আবার গণতন্ত্র, শাসনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সাথেও 'তন্ত্র' শব্দের সম্পর্ক রয়েছে। তাই অশ্লীল ও কদাচার অর্থে এর ব্যবহার যুক্তিযুক্ত কিনা, তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

বৈদিকী প্রজ্ঞার লৌকিকী রূপ তথা ভাষ্যাদিই হচ্ছে পুরাণ। এ ভাষ্যাদির সব অংশ সমানভাবে সবার জন্যই প্রযোজ্য। ভাব-ভাষা-ছন্দ-সূত্র অনুসারে যে বেদবিভাজন – তার মাধ্যমে একদল মানুষ ঋগ্বেদীয় আবার অন্যদল সামবেদীয় কিংবা অথর্ববেদীয় হিসেবে আখ্যায়িত হয় কী'ভাবে? হতে পারে শুধু বেদীয় অথবা চতুর্বেদীয় এবং সেটাই হওয়া সমীচীন। কিন্তু **'এক বেদ'** থেকে নানামতে কিংবা নানাপথে বিভক্তি তো কাম্য হতে পারে না। বস্তুত এ ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য দায়ী সমাজের কিছুসংখ্যক অদূরদর্শী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তথা পুরোহিতবর্গ। ভারতবর্ষে উদ্ভূত ধর্মানুসারীদের মধ্যে যে সীমাহীন বিপন্নতা ও বিশৃঙ্খলভাব পরিলক্ষিত হয়, তার প্রধান কারণ পুরোহিতবর্গের বৈষম্যপন্থী ধর্মীয় বিধিবিধানসংবলিত পুরোহিত দর্পণের পক্ষে অত্যন্ত নগ্নভাবে অবস্থান গ্রহণ। এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হওয়া উচিত সমাজের বৃহত্তর স্বার্থেই। চলমান পুরোহিত দর্পণের বিধানমতে দেখা যায় কেউ শ্রাদ্ধ করবে ১১ দিনে, কেউ করবে ১৩ দিনে, কেউ করবে ১৬ দিনে আবার কেউ করবে ৩১ দিনে। **'শুধ্যেদ্ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ। বৈশ্য পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি।'** স্মৃতির এ বিধান কি বৈদিক দর্শনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? গীতায় কি এ বিধির কোন সমর্থন আছে? যে সব বিধিবিধান গীতা তথা শ্রুতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সে সব বিধিবিধান বহাল রাখার কোন সুযুক্তি আছে কিনা? ঋগ্বেদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে, **"তোমরা সকলে একসঙ্গে চল। এক চিন্তায় স্নাত হয়ে সবে একসঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ কর। সকলে জান সকলের মনকে এবং ভালবাস সবাইকে। সকলের মন, মন্ত্র, চিন্তা-অভিপ্রায় সর্বাংশে এক হোক।"** (ঋক্ ১০/১৯১/২-৪) গরুড় পুরাণের উত্তর খণ্ড ৬/৪০ শ্লোকে উল্লেখ আছে, **"যে প্রেতের উদ্দেশ্যে একাদশদিনে বৃষোৎসর্গ সম্পন্ন না হয় তার উদ্দেশ্যে শত শত শ্রাদ্ধ করলেও তার প্রেতত্বের বিমুক্তি ঘটে না।"** উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, সকল সম্প্রদায়েরই (পূর্বোক্ত বর্ণসমূহের) ১০ দিন অশৌচান্তে একাদশ দিনে বৃষোৎসর্গ করে শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সম্পন্ন করা কর্তব্য। আর ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের বিধি আর শূদ্রের বিধি তো কোনমতেই ভিন্ন হতে পারে না। সমাজে 'ব্রাহ্মণ' একটি উন্নত পদ তথা স্তর বিধায় সবাইকে হতে হবে ব্রাহ্মণের অনুসারী। আমরা সবাই ব্রাহ্মণ হবো – এটাই এখন আমাদের লক্ষ্য ও ধর্ম। সনাতন ধর্মের মুখপত্র অমৃতের সন্ধানে ও হরেকৃষ্ণ সমাচারের মাধ্যমে ইস্কন এখন তা-ই প্রচার করে চলেছে। বস্তুত সবার জন্য শ্রাদ্ধ

একই দিনে, অর্থাৎ ১১দিনে সম্পন্ন হবে – এটাই তো শাস্ত্রসম্মত বিধি ও যুক্তিযুক্ত। উল্লেখ্য, ৬ এপ্রিল ১৯৭৫'এ নারায়ণগঞ্জ সনাতন ধর্ম সম্মেলনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব (এ যুগের মহর্ষি) ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ বেদ-পুরাণের আলোকে **'সর্ববর্ণে দশাশৌচ প্রবর্তন'** প্রস্তাব উত্থান করলে সর্বসম্মতিক্রমে তা পাশ হয়। এর পরেও 'সর্ববর্ণে দশাশৌচ' প্রবর্তন প্রশ্নে সংশয় ও বিভ্রান্তি থাকে কী'করে? এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বসহকারে ভাবা দরকার।

সমাজে জাতিভেদ নামীয় বংশানুক্রমিক যে বৈষম্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তা আসলে ধর্মবিরোধী; পুরুষসূক্তের অপব্যাখ্যা। সমাজের স্বার্থেই এ ধরনের বৈষম্যতা মানা চলে না; কিংবা আর মানা উচিত নয়। সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে সামাজিক স্বার্থকে; আর সামাজিক বন্ধন তথা ঐক্যের ভিত্ সুদৃঢ় করা যায় আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ প্রসারের মাধ্যমেও – যা বাস্তবায়ন করা সংঘ-সমিতিরও একটা প্রধান লক্ষ্য। সম্প্রদায় যেহেতু শাস্ত্রীয় গুণকর্মের ভিত্তিতে বিন্যস্ত নয়, সেহেতু সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সব বর্ণের গুণসম্পন্ন মানুষ খুঁজে পাওয়াও কোন দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। আমার মনে হয় বর্তমানে এটা খুবই সহজ ব্যাপার। আর বিবাহের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে সামজিক স্বার্থ, পারিবারিক মর্যাদা ও অবস্থান, খাদ্য ও রুচিবোধ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, পেশা, রক্তের গ্রুপ ইত্যাদি। কিন্তু এটা তো চলমান বংশানুক্রমিক কোন ধারার মধ্যে পড়ে না। বৈদিক যুগেও তা ছিল না। এভাবে ভাবলে আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহের প্রসার ঘটানোর সুযোগ রয়েছে সামাজিক উদ্যোগে এবং ধর্মসম্মতভাবেই।

সংবিধান একটি রাষ্ট্রর সর্বোচ্চ আইন। রাষ্ট্র চলেই সংবিধান বলে। অন্যান্য সব আইন অবশ্যই সংবিধানির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া দরকার। একটি রাষ্ট্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর বহিঃপ্রকাশই ঘটে তার প্রণীত সংবিধানের মাধ্যমে। সংবিধান যদি বৈষম্যমুক্ত হয় তবে তার প্রভাব সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে পড়তে বাধ্য। অনুরূপ লিখিত সংবিধান কিন্তু সমাজ ও ধর্মজীবনেও থাকা প্রয়োজন এবং তা থাকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সুবিধা হয় কিংবা হতো। আমাদের সমাজে সংবিধানের স্থান দখল করে আছে পন্ডিত সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সঙ্কলিত **"পুরোহিত দর্পণ"**– যা রঘুনন্দন-স্মৃতিনির্ভর এবং সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। আমার ধারণা, সমাজের ভেতরকার সবরকম ভেদাভেদ ও বৈষম্যই টিকে আছে তথাকথিত এ ধরনের ধর্মবিধানের কারণে। বেদ-ভাগবত-গীতা কিংবা মহাসম্মেলনের ঘোষণার আলোকে কি এ ধরনের বৈষম্যহীন, উদার ও সর্বজনীন **"সনাতন ধর্ম জীবনবিধান"** নামের কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা যায় না? আদর্শ গুরু, শিক্ষক কিংবা পথপ্রদর্শক সবসময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্য **'দশ গুরুর প্রবর্তিত'** বৈষম্যমুক্ত **'শিখধর্মে'** দেখা যায় গ্রন্থই গুরু হিসেবে মান্য হচ্ছে। শিখধর্মের প্রথম গুরু (ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত) গুরুনানক পুরোপুরি অহিংসবাদী ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁর সাথে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গভাব ছিল। বয়োঃজ্যেষ্ঠ হিসেবে মহাপ্রভু তাঁকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং তাঁর সাথে ধর্মসংস্থাপন প্রশ্নে মত ও ভাব বিনিময় করতেন। পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবের সময় একবার (১৫১২ খ্রিস্টাব্দে) মহাপ্রভু ও গুরুনানক একত্রে নামজপ করেন। এ নামজপ অনুষ্ঠানে মহাপ্রভুর অনেক শিষ্য এবং অনুসারীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা একত্রে বসে দীর্ঘক্ষণ পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন গুণগান এবং লীলা সম্পর্কে ভাবের আদান-প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের মুক্তির জন্য যেমন **"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র"** জপের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন; তেমনি একেশ্বরবাদী শিখগুরু নানকও তাঁর বিভিন্ন বাণীতে **"রাম"** ও **"হরির"** কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেছেন। গুরুগ্রন্থে তার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি এ যুগেও 'গ্রন্থসাহেব' থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। সামাজিক ভেদবৈষম্য দূর করতে হলে দরকার রাষ্ট্রীয় সংবিধানের মতো একটি বৈষম্যমুক্ত ধর্মীয় ও সামাজিক সংবিধান। একজন ব্যক্তি (পন্ডিত সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য কিংবা পন্ডিত শ্রী শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য) যদি একক প্রচেষ্টায় এ ধরনের সংবিধান সঙ্কলন কিংবা রচনা করতে সমর্থ হন, তবে বেদ-উপনিষদ-গীতা-ভাগবত-পুরাণের আলোকে সংঘ-সমিতি-পরিষদ কেন এ কাজটা করতে সমর্থ হচ্ছে না তা আমার কাছে মোটেই বোধগম্য নয়। নাকি এ ধরনের প্রস্তাব আগে কখনো উত্থাপিতই হয়নি? যদি তা না হয়ে থাকে তবে আমিই প্রস্তাব উত্থাপন করছি বেদভিত্তিক ধর্মের আলোকে এ ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিবিধানসংবলিত উদার ও সর্বজনীন একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করতে, যা স্থলাভিষিক্ত হতে পারে বর্তমান পুরোহিত দর্পণের এবং মান্য হতে পারে গ্রন্থসাহেবের মতো গুরু হিসাবেও।

****

(পাদটীকাঃ ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশনের ১৯৮৮ সালের কাঠমান্ডু সম্মেলনে পুরোহিত দর্পণ সংস্কার প্রশ্নে কোন আলোচনাই হয়নি। কেবল একটি ধ্বনি কিংবা স্লোগানের মাধ্যমে কোন সম্প্রদায়ের দুর্নীতি ও জন্মগত বৈষম্য দূর করা কি সম্ভব? **'আমরা সবাই ব্রাহ্মণ হবো'** – এ স্লোগানটিও তো বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি কিংবা ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশনের নিজস্ব নয়। এ স্লোগান বাস্তবায়নের সর্বপ্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রভুপাদ ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বস্তুত এ স্লোগানটি সম্পূর্ণই ইস্‌কনের – যা ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন গ্রহণ করে ১৯৮৮ সালের কাঠমান্ডু সম্মেলনে। তবে এখনও দেশে-বিদেশে এর বাস্তবায়নের কাজ একমাত্র ইস্‌কনের মাধ্যমেই এগিয়ে চলছে; অন্য কোন সংঘ-সমিতির কার্যক্রমের মধ্যে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ আজ পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। –

চলবে...

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত হলো প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সারাতিসার। পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্য উপস্থাপন করা হলো। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করা হচ্ছে-

প্রথম স্কন্ধ : "সৃষ্টি"

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সপ্তম অধ্যায়

শ্লোক-১৯

যদাশরণমাত্মানমৈক্ষত শ্রান্তবাজিনম্।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো মেনে আত্মত্রাণং দ্বিজাত্মজঃ॥১৯॥

যদা-যখন; **অশরণম্**-উপযুক্তভাবে রক্ষিত না হয়ে; **আত্মানম্**-স্বয়ং; **ঐক্ষত**-দেখে; **শ্রান্ত-বাজিনম্**-শ্রান্ত অশ্ব; **অস্ত্রম্**-অস্ত্র; **ব্রহ্ম-শিরঃ**-পরম (আণবিক) অস্ত্র; **মেনে**-প্রয়োগ করেছিল; **আত্ম-ত্রাণম্**-নিজেকে রক্ষা করার জন্য; **দ্বিজ-আত্ম-জঃ**-ব্রাহ্মণের পুত্র।

অনুবাদঃ

দ্বিজপুত্র (অশ্বত্থামা) যখন দেখল যে তার অশ্বগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তখন সে বিবেচনা করল যে ব্রহ্মশির নামক (পারমাণবিক অস্ত্র চরম অস্ত্র ব্যবহার করা ছাড়া তার আত্মরক্ষা করার আর কোনও উপায় নেই।

তাৎপর্য

যখন আর অন্য কোনও গতি থাকে না, সেই চরম সংকটের সময়েই কেবল ব্রহ্মশির নামক পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়। এখানে দ্বিজাত্মজঃ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেন না অশ্বত্থামা যদিও ছিল দ্রোণাচার্যের পুত্র, তবুও সে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিল না। সব চাইতে উন্নত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষকে বলা হয় ব্রাহ্মণ, এবং তা কোন জন্মগত উপাধি নয়। পূর্বে অশ্বত্থামাকে ব্রহ্মবন্ধু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণের বন্ধু বলতে গুণগতভাবে ব্রাহ্মণকে বোঝায় না। ব্রাহ্মণের বন্ধু অথবা পুত্র, যখন পূর্ণরূপে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, তখনই কেবল তাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়, তাই এখানে তাকে ব্রাহ্মণের পুত্র অথবা দ্বিজাত্মজ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

শ্লোক-২০

অথোপস্পৃশ্য সলিলং সংদধে তৎসমাহিতঃ॥
অজানন্নপিসংহারং প্রাণকৃচ্ছ্র উপস্থিতে॥২০॥

অথ-এইভাবে; **উপস্পৃশ্য**-পবিত্র হওয়ার জন্য স্পর্শ করে; **সলিলম্**-জল; **সংদধে**-মন্ত্র উচ্চারণ করে; **তৎ**-তা; **সমাহিতঃ**-একাগ্র চিত্তে; **অজানন্**-না জেনে; **অপি**-যদিও; **সংহারম্**-সংবরণ; **প্রাণকৃচ্ছ্র**-জীব বিপন্ন হওয়ায়; **উপস্থিতে**-সেই রকম অবস্থায় পতিত হয়।

অনুবাদ

তার জীবন বিপন্ন হওয়ার ফলে সে জল স্পর্শপূর্বক আচমন করে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করার জন্য একাগ্র চিত্তে মন্ত্র উচ্চারণ করল, যদিও সে জানত না কিভাবে সেই অস্ত্রটিকে সংবরণ করা যায়।

তাৎপর্য

সূক্ষ্ম জড় কার্যকলাপ স্থূল জড় কার্যকলাপের থেকে অধিক শক্তিশালী। এই ধরনের সূক্ষ্ম কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় বিশুদ্ধ শব্দের প্রভাবে,যাকে বলা হয় মন্ত্র। এখানে সেই মন্ত্রের প্রভাবে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের পন্থা উল্লিখিত হয়েছে।

শ্লোক-২১

ততঃ প্রাদুস্কৃতং তেজঃ প্রচণ্ডং সর্বতোদিশম্ ।
প্রাণাপদমভিপ্রেক্ষ্য বিষ্ণুং জিষ্ণুরুবাচ হ।।২১।।

ততঃ-তার ফলে; **প্রাদুস্কৃতম্**-বিকীরিত; **তেজঃ**-তেজরাশি; **প্রচণ্ডম**-প্রচণ্ড; **সর্বতঃ**-সর্ব; **দিশম্**-দিকে; **প্রাণাপদম্**-প্রাণ বিপন্ন; **অভিপ্রেক্ষ্য**-তা দেখে; **বিষ্ণুম্**-ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **জিষ্ণুঃ**-অর্জুন; **উবাচ**-বলেছিলেন; **হ**-পূর্বে।

অনুবাদ

তার ফলে এক প্রচণ্ড তেজরাশি সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তা এত প্রচণ্ড ছিল যে অর্জুন মনে করেছিলেন যে তাঁর জীবন বিপন্ন, এবং তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন।

শ্লোক-২২

অর্জুন উবাচ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তনামভয়ঙ্কর।
ত্বমেকো দহ্যমানানামপবর্গো হসি সংসৃতেঃ ।।২২।।

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; **কৃষ্ণ**-হে কৃষ্ণ; **কৃষ্ণ**-হে কৃষ্ণ; **মহাবাহো**-সর্বশক্তিমান; **ভক্তানাম্**-ভক্তদের; **অভয়ঙ্কর**-অভয় দানকারী; **ত্বম্**-তুমি; **একঃ**-একমাত্র; **দহ্য-মনানাম্**-দুখঃ-দুর্দশাক্লিষ্ট; **অপবর্গঃ**-মুক্তির পথ; **অসি**-হও; **সংসৃতেঃ**-জড় জগতের দুঃখ-কষ্টের মধ্যে।

অনুবাদ

অর্জুন বললেনঃ হে কৃষ্ণ, তুমি হচ্ছ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান। তোমার বিভিন্ন শক্তির কোন সীমা নেই। তাই তুমি তোমার ভক্তদের হৃদয়ে অভয় দান করতে পার। জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার তাপে দগ্ধ সকলেরই মুক্তির পথ হচ্ছ তুমি।

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তা উপলব্ধি করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অর্জুনের উক্তি সর্বতাভাবে প্রামাণিত। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান এবং তিনি বিশেষ করে ভক্তদের অভয় দানকারী। ভগবানের অস্তিত্ব হচ্ছে অনেকটা বনের মধ্যে দাবানলের মতো, যা কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবেই নির্বাপিত হতে পারে। গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপার মূর্ত প্রকাশ। তাই যে মানুষ সংসাররূপী দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে, সে ভগবত্তত্ত্ববেত্তা সদগুরুর মাধ্যমে করুণার বৃষ্টি লাভ করতে পারে। সদগুরু তাঁর উপদেশের মাধ্যমে ত্রিতাপ দুঃখ জর্জরিত মানুষের হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশ করতে পারেন, এবং এই দিব্য জ্ঞানই কেবল সংসাররূপী দাবানলের আগুন নির্বাপিত করতে পারে।

শ্লোক-২৩

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিতআত্মনি ।।২৩।।

ত্বম-আদ্যঃ-তুমিই হচ্ছ আদি; **পুরুষঃ**-আনন্দ উপভোগকারী পুরুষ; **সাক্ষাৎ**-সাক্ষাৎ; **ঈশ্বরঃ**-নিয়ন্তা; **প্রকৃতেঃ**জড়া প্রকৃতির; **পরঃ**-অতীত; **মায়াম্**-জড়া শক্তি; **ব্যুদস্য**-যিনি পরিহার করেছেন; **চিচ্ছক্ত্যা**-চিৎ শক্তির দ্বারা; **কৈবল্যে**-শুদ্ধ দিব্য জ্ঞান এবং আনন্দে; **স্থিতঃ**-অবস্থিত; **আত্মনি**-স্বয়ং।

অনুবাদ

তুমিই হচ্ছ সেই আদি পুরুষ ভগবান যিনি সৃষ্টির সর্বত্র নিজেকে বিস্তার করেছেন এবং যিনি হচ্ছেন মায়াশক্তির অতীত। তুমি তোমার চিৎ শক্তির প্রভাবে জড়া প্রকৃতির প্রভাব প্রতিহত করেছ। তুমি সর্বদাই চিন্ময় জ্ঞান এবং আনন্দে অধিষ্ঠিত।

তাৎপর্য

'ভগবদ্গীতায় ভগবান বলছেন যে কেউ যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, তখন তিনি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সূর্যের মতো, এবং মায়া অথবা জড় অস্তিত্ব হচ্ছে অন্ধকার। সূর্যের আলোকের প্রকাশ হলে, তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যায়। এখানে জড় জগতের অজ্ঞানান্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁর থেকে অন্য সমস্ত অবতারেরা প্রকাশিত হন। সর্বব্যাপ্ত শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ। ভগবান অসংখ্য অবতাররূপে অসংখ্য জীবরূপে এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তিরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ ভগবান, তার থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। ভগবানের সর্বব্যাপকতা, যা এই জড় জগতে উপলব্ধ হয় তা হচ্ছে ভগবানের অংশ প্রকাশ। তাই পরমাত্মাও তাঁরই অধীন তত্ত্ব। তিনি হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম। জড় জগতের কর্ম এবং কর্মফলের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, কেন না তিনি জড় সৃষ্টির অনেক অনেক উর্দ্ধে। অন্ধকার হচ্ছে সূর্যের বিকৃত প্রকাশ এবং তাই অন্ধকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে সূর্যের উপর, কিন্তু সূর্যে অন্ধকারের কোন অস্তিত্ব নেই। সূর্য যেমন পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান এই জড় অস্তিত্বের অতীত পূর্ন আনন্দময়। তিনি কেবল আনন্দময়ই নন, তিনি সব রকম দিব্য বৈচিত্র্যে পূর্ণ। তিনি ত্রিগুণাত্মিকা, জড়া প্রকৃতির অতীত। তিনি পরম, অর্থাৎ তিনি প্রধান। তাঁর শক্তি অসংখ্য, এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, প্রকাশিত করেন, পালন করেন এবং ধবংস করেন। কিন্তু তাঁর স্বীয় ধামে সব কিছুই নিত্য এবং পরম। তাঁর শক্তিসম্পন্ন প্রতিনিধিরা স্বতন্ত্রভাবে এই জড় জগৎ পরিচালিত করেন না, তা তাঁরা পরিচালনা করেন তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে, তারই নির্দেশ অনুসারে।

শ্লোক-২৪

স এব জীবলোকস্য মায়ামোহিতচেতসঃ।
বিধৎসে স্বেন বীর্যেণ শ্রেয়ো ধর্মাদিলক্ষণম্ ।।২৪।।

সঃ-সেই চিন্ময়; **এব**-অবশ্যই; **জীব-লোকস্য**-বদ্ধ জীবদের; **মায়া-মোহিত**-মায়ার দ্বারা মোহিত; **চেতসঃ**-চেতনার দ্বারা; **বিধৎসে**-সম্পাদন করে; **স্বেন**-তুমি স্বয়ং; **বীর্যেণ**-প্রভাবের দ্বারা; **শ্রেয়**-পরম মঙ্গলময়; **ধর্মাদি**-চতুর্বর্গ; **লক্ষণম্**-লক্ষণের দ্বারা।

অনুবাদ

যদিও তুমি এই জড়া প্রকৃতির অতীত, তবুও বদ্ধ জীবের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য তুমি চতুর্বর্গাদি অনুষ্ঠান করে

মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন কর।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই জড় জগতে অবতরণ করেন, কিন্তু তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি অবশ্যই জড়া প্রকৃতির অতীত। তিনি তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে অবতরণ করেন মায়ার দ্বারা মোহিত বদ্ধ জীবদের পুনরুদ্ধার করার জন্য। বদ্ধ জীবেরা মায়াশক্তির দ্বারা আক্রান্ত, এবং ভ্রান্তভাবে তারা মায়া উপভোগ করতে চায়, যদিও স্বরূপগতভাবে জীব কখনও ভোগ করতে পারে না। জীব সর্ব অবস্থাতেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবক, এবং যখন সে তার এই প্রকৃত অবস্থার কথা ভুলে যায়, তখন সে জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করতে চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি হচ্ছে তার মায়াবদ্ধ অবস্থা। ভগবান অবতরণ করেন জীবের এই ভ্রান্ত উপভোগের বাসনা মোচন করে জীবকে তাঁর ধামে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। সেটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবের প্রতি পরম ভগবানের করুণার প্রকাশ।

শ্লোক-২৫

তথায়ং চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া।
স্বানাং চানন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ ॥২৫॥

তথা-এইভাবে; **অয়ম্**-এই; **চ**-এবং; **অবতারঃ**-অবতার; **তে**-তোমার **ভুবঃ**-জড় জগতের; **ভার**-ভার; **জিহীর্ষয়া**-দূর করার জন্য; **স্বানাম্**-বন্ধুদের; **চ অনন্য-ভাবানাম্**-এবং অনন্য ভক্তদের; **অনুধ্যানায়**-পুনঃ পুনঃ স্মরণ করার জন্য; **চ**-এবং; **অসকৃৎ**-পূর্ণরূপে তৃপ্ত।

অনুবাদ

এইভাবে ভূ-ভাব হরণ করার জন্য এবং তোমার সখাদের এবং তোমার অনন্য ভক্তদের নিরন্তর তোমার কথা স্মরণ-করাবার জন্য তুমি অবতরণ কর।

তাৎপর্য

এখানে মনে হয় যেন ভগবান তাঁর ভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। সকলেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তিনি সকলের প্রতিই সমাভাবাপন্ন, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর আপনজন-তাঁর ভক্তদের প্রতি অধিক অনুগ্রহশীল। ভগবান সকলেরই পিতা। কেউই তাঁর পিতা হতে পারে না, এবং কেউ তাঁর পুত্রও হতে পারে না। কিন্তু তাঁর ভক্তরা হচ্ছেন তাঁর আপনজন, এবং তাঁর ভক্তরা তাঁর আত্মীয়-স্বজন। এটি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা। এর সঙ্গে জড় জগতের পিতা-মাতা আদি আত্মীয়তার সম্পর্কের কোন সাদৃশ্য নেই। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জড় গুণের অতীত, এবং তার ফলে ভক্তিমার্গে তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং আপনজনদের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক তার সঙ্গে জড় জগতের কোন যোগাযোগ নেই।

শ্লোক-২৬

কিমিদং স্বিৎকুতো বেতি দেবদেব ন বেদ্ম্যহম্ ।
সর্বতোমুখমায়াতি তেজঃ পরমদারুণম্ ।।২৬।।

কিম্-কি; **ইদম্**-এই; **স্বিৎ**-আসে; **কুতঃ**-কোথা থেকে; **বেতি**-অন্যথায়; **দেব-দেব**-দেবতাদের দেবতা; **ন**-না; **বেদ্মি**-আমি জানি; **অহম্**-আমি; **সর্বতঃ**-সর্বত্র; **মুখম্**-দিকসকল; **আয়াতি**-আসছে; **তেজঃ**-তেজ **পরম**-পরম; **দারুণম্**-ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

হে দেবতাদের দেবতা, এই ভয়ঙ্কর তেজ কিভাবে সর্বত্র বিস্তৃত হচ্ছে? তা আসছে কোথা থেকে? আমি তা বুঝতে পারছি না।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে যা নিবেদন করা হয় তা সশ্রদ্ধ বন্দনার মাধ্যমে নিবেদন করতে হয়; সেটিই হচ্ছে প্রচলিত রীতি, এবং অর্জুন যদিও হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ সখা, তবুও জনসাধারণের শিক্ষার্থে তিনি সেই নীতি অনুসরণ করছেন।

শ্লোক-২৭

শ্রীভগবানুবাচ

বেত্থেদং দ্রোণপুত্রস্য ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রদর্শিতম্ ।
নৈবাসৌ বেদ সংহারং প্রাণাবাধ উপস্থিতে ॥২৭॥

শ্রী ভগবান উবাচ-পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বেত্থ**-আমার কাছ থেকে জেনে রাখ; **ইদম্**-এই; **দ্রোণ-পুত্রস্য**-দ্রোণাচার্যের পুত্র; **ব্রাহ্মম্ অস্ত্রম্**- ব্রাহ্ম (পারমাণবিক) অস্ত্র প্রয়োগ করার মন্ত্র; **প্রদর্শিতম্**-দর্শিত; **ন**-না; **এব**-এমন কি; **অসৌ**-সে; **বেদ**-জানে; **সংহারম্**-সংবরণ; **প্রাণাবাধ**-প্রাণবধ; **উপস্থিতে**-উপস্থিত হয়েছে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেনঃ এটি দ্রোণপুত্রের কর্ম। যদিও সে সেই অস্ত্র সংবরণ করার উপায় জানে না, তবুও সে এই ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। সে তার আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে এই কাজ করেছে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মশির অস্ত্র অনেকটা আধুনিক যুগের পারমাণবিক অস্ত্রের মতো। পারমাণবিক শক্তি সব কিছু দহন করতে পারে এবং ব্রহ্মাস্ত্রও তা পারে। তা আণবিক তেজ বিকীরণের মতো এক অসহ্য তাপ সৃষ্টি করে, কিন্তু তাদের মধ্যে

পার্থক্য হচ্ছে যে, আণবিক অস্ত্র হচ্ছে স্থূল, কিন্তু ব্রহ্মশির অস্ত্র হচ্ছে মন্ত্রের প্রভাবে বস্তুত সূক্ষ্ম অস্ত্র। এটি এক ভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান, এবং পুরাকালে এই বিজ্ঞান ভারতবর্ষে অনুশীলন করা হত। মন্ত্র উচ্চারণরূপ যেসূক্ষ্ম বিজ্ঞান তাও জড়, কিন্তু আধুনিক জড় বৈজ্ঞানিকেরা এখনও সে সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে নি। সূক্ষ্ম জড় বিজ্ঞান পারমার্থিক নয়, কিন্তু তবুও তার সঙ্গে পারমার্থিক পন্থার সরাসরি যোগ রয়েছে, যা হচ্ছে আরও অধিক সূক্ষ্ম। মন্ত্র উচ্চারণকারী জানতেন কিভাবে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়, এবং কিভাবে তা সংবরণ করতে হয়। সেটিই ছিল পূর্ণ জ্ঞান। কিন্তু দ্রোণচার্যের পুত্র, যে এই সূক্ষ্ম বিজ্ঞান ব্যবহার করেছিল, সে জানত না কিভাবে সেই অস্ত্র সংবরণ করতে হয়। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে সে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল এবং তার ফলে এই প্রয়োগ কেবল অসমীচীনই ছিল না, তা ছিল অধার্মিক। ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে এত ভুল করা তার উচিত হয়নি, এবং তার কর্তব্যকর্মের প্রতি প্রচণ্ড অবহেলার জন্য ভগবান তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

শ্লোক-২৮

ন হ্যস্যান্যতমং কিঞ্চিদস্ত্রং প্রত্যবকর্শনম্।
জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধমস্ত্রজ্ঞো হ্যস্ত্রতেজসা ॥২৮॥

ন—না; **হি**—অবশ্যই; **অস্য**—এর; **অন্যতমম্**—অন্য; **কিঞ্চিৎ**—কোন রকম; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **প্রতি**—প্রতি; **অবকর্শনম্**—প্রতিক্রিয়া; **জহি**—প্রতিহত করা; **অস্ত্র-তেজঃ**—অস্ত্রের তেজ; **উন্নদ্ধম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **অস্ত্রজ্ঞঃ**—অস্ত্রবিশারদ; **হি**—কার্যত; **অস্ত্র-তেজসা**—তোমার অস্ত্রের প্রভাবের দ্বারা।

অনুবাদ

হে অর্জুন, আর একটি ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারাই কেবল এই অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করা যাবে। তুমি হচ্ছ অস্ত্রবিশারদ, তোমার নিজের অস্ত্রের দ্বারা তুমি এই অস্ত্রের তেজ প্রতিহত কর।

তাৎপর্য

আণবিক অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করার মতো কোন অস্ত্র আধুনিক যুগে আবিষ্কার করা হয়নি। কিন্তু সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করা সম্ভব ছিল, এবং পুরাকালে যাঁরা অস্ত্র-বিজ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন তাঁরা ব্রহ্মশির অস্ত্রকে প্রতিহত করতে পারতেন। দ্রোণাচার্যের পুত্র সেই অস্ত্র সংবরণ করার কৌশল জানত না, এবং তাই ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর নিজের অস্ত্রের দ্বারা সেই অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করতে।

শ্লোক-২৯

সূত উবাচ
শ্রুত্বা ভগবতা প্রোক্তং ফাল্গুন পরবীরহা।
স্পৃষ্টাপস্তং পরিক্রম্য ব্রাহ্মং ব্রাহ্মাস্ত্রং সংদধে ॥২৯॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **প্রোক্তম্**—উক্ত; **ফাল্গুনঃ**—ফাল্গুনী (অর্জুনের-আর একটি নাম); **পরবীরহা**—প্রতিপক্ষের বীরদের হত্যাকারী; **স্পৃষ্টা**—স্পর্শ করে; **অপঃ**—জল; **তম্**—তাঁকে; **পরিক্রম্য**—পরিক্রমা করে; **ব্রাহ্মম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ব্রাহ্মাস্ত্রম্**—পরম অস্ত্র; **সংদধে**—ক্রিয়া করলেন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেনঃ পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সে কথা শুনে অর্জুন পবিত্র হওয়ার জন্য জল স্পর্শ করে আচমন করলেন, এবং তারপর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে তিনি ব্রহ্মশির অস্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য তাঁর ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করলেন।

শ্লোক-৩০

সংহত্যান্যোন্যমুভয়োস্তেজসী শরসংবৃতে।
আবৃত্য রোদসী খং চ ববৃধাতেঽর্কবহ্নিবৎ॥৩০॥

সংহত্য—সমন্বয়ের দ্বারা; **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **উভয়োঃ**—উভয়ের; **তেজসী**—তেজের দ্বারা; **শর**—অস্ত্র; **সংবৃতে**—আচ্ছাদন করে; **আবৃত্য**—আবৃত করে; **রোদসী**—পূর্ণ প্রভাব; **খম্ চ**—নভোমণ্ডলও; **ববৃধাতে**—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে; **অর্ক**—সূর্যমণ্ডল; **বহ্নিবৎ**—অগ্নির মতো।

অনুবাদ

সেই দুটি ব্রহ্মশির অস্ত্রের তেজপুঞ্জের সংঘর্ষের ফলে সূর্যমণ্ডলের মতো এক প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড নভোমণ্ডল এবং সমস্ত গ্রহগুলি আচ্ছাদিত করেছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্মশির অস্ত্রের সংঘর্ষের ফলে যে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রলয়কালে সূর্যের আগুনের মতো। আণবিক অস্ত্রের প্রভাবে যে তাপ সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মশির অস্ত্রের তুলনায় সেই তাপ অত্যন্ত নগণ্য। পারমাণবিক অস্ত্র বড় জোর একটি গ্রহকে ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মশির অস্ত্র সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই সেই তাপের সঙ্গে প্রলয়াগ্নির তুলনা করা হয়েছে।

চলবে...

আদর্শ গৃহস্থ জীবন

স্ত্রীকে সুরক্ষা দান করা স্বামীর কর্তব্য

কৃষ্ণভাবনাময় বিবাহ এমন কোনো সস্তা জিনিষ নয় যে খামখেয়ালি মতো তাকে জড়িয়ে ধরব এবং পরমুহূর্তেই ছুঁড়ে ফেলে দেব। বিবাহে ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রী যেন পরস্পরকে সমগ্র জীবনকাল ধরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। প্রয়োজনে বাইরে কাজ করে, বাইরে কোনও ঘর নিয়ে সন্তান লালন-পালন করতে হবে। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে

বিবাহ বন্ধন এক গুরুতর দায়িত্বের বন্ধনও বটে। কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থ এই দায়িত্বকে কখনও হীন চোখে দেখেন না। অন্যথায় বিবাহ একটি প্রহসন মাত্র।

একটু অশান্তি হলেই স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাওয়া– সে তো সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষেও করছে। এমনকি সাধন ভজনের দোহাই দিয়েও, অকস্মাৎ স্ত্রীকে ত্যাগ করা উচিত নয়। একবার যদি এই গৃহস্থ আশ্রমকে বরণ করা হয়, তখন গৃহস্থকে সমস্ত অসুবিধা সহ্য করেও তার স্বধর্ম পালন করতে হবে।

অবশ্য পুরুষের পক্ষে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকাটাই শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু অনেক মহিলাও কৃষ্ণভক্ত হতে চাইছে। আমরা তাদের ত্যাগ করতে পারি না (শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষামৃত, পৃষ্ঠা ৮৬৯)

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন যে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র–সকলেই তাঁর আশ্রয় নিয়ে শুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং এদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। এই সংরক্ষণের জন্যই মেয়েদের বিবাহিতা হওয়া প্রয়োজন।

অবশ্য মেয়েরা যদি অবিবাহিতা থাকতে পারে এবং মন্দির যদি তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে–সেটাও মন্দ নয় (শিক্ষামৃত, পৃঃ ৮৬৯)। যেমন, খ্রিস্টান গির্জাসমূহে অনেক সময়ে কুমারী মেয়েদের সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকে।

তবে যদি যৌন বাসনা থাকে, কেমন করে তা দমন করা যায়? সাধারণত মেয়েরা পুরুষদের থেকেও বেশি কামার্ত এবং তাদেরকে বলা হয় অবলা। সাধারণত স্বামীর সাহায্য ছাড়া মেয়েদের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক প্রগতি সাধন করা খুবই কঠিন। বহু কারণে মেয়েদের বিবাহিতা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিবাহের পর স্বামী যদি অকস্মাৎ স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যায়, তা হলে তা কখনই স্ত্রীর পক্ষে সুখদায়ক হতে পারে না।

গৃহস্থ আশ্রম ভক্তির প্রতিবন্ধক নয়

বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ অবৈদিক। তবে যদি এমন দেখা যায় যে, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই খুব উন্নত ভক্ত এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে স্ত্রী যদি অত্যন্ত আনন্দিতভাবে স্বামীকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেন, তা হলে বিচ্ছেদ সম্ভব এবং তা সঙ্গত।

তবে এক্ষেত্রেও সন্ন্যাস গ্রহণের সময় স্বামীকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে স্বামীর অনুপস্থিতিতেও স্ত্রী'র কোনো অসুবিধা না হয়। স্ত্রী যাতে নিরাপদভাবে সংরক্ষণ পায় এবং তাকে যেন ভালভাবে যত্ন নেওয়া হয়– সেই সম্বন্ধে স্বামীকে নিশ্চিত হতে হবে।

স্ত্রীকে নিরাপত্তাহীন এবং অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে সন্ন্যাস গ্রহণ করা স্বামীর উচিত নয়। কেউ হয়ত স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সন্ন্যাস নিয়ে থাকে এবং তার ফলে স্ত্রীকে অনেক সময় দুঃখের মধ্যে জীবন যাপন করতে হয়। স্ত্রী মানসিক দিক থেকে অসুখী জীবন যাপন করে।

তাই শ্রীল প্রভুপাদ সেই রকম সন্ন্যাস অনুমোদন করেননি। তিনি ভবিষ্যতের গৃহস্থ ভক্তদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাই উত্তর পুরুষরা যাতে মন্দ দৃষ্টান্তের প্রভাবে ভুল পথে ধাবিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদ খুব সতর্কভাবে সন্ন্যাস অনুমোদন করতেন।

ইচ্ছা হলেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুদিন যেতে না যেতেই বিবাহ-বিচ্ছেদ যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে এই অজুহাত খাটবে না যে, গৃহস্থ আশ্রম ভক্তি জীবনের পক্ষে প্রতিবন্ধক। পারমার্থিক প্রগতি সম্পর্কে এটি হচ্ছে একটি ভ্রান্ত ধারণা।

স্বধর্ম অবশ্যই পালন করতে হবে। চার বর্ণ এবং চার আশ্রমের কোনও একটি স্তরকে আমার স্বধর্ম রূপে গ্রহণ করে নিযুক্ত হওয়ার পর তা খামখেয়ালিভাবে পরিবর্তন বা ত্যাগ করা আমাদের উচিত নয়–এটি সবচেয়ে বড় ভুল। ভক্তি এসবের উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং একবার আমি যা ঠিক করেছি, তাতে স্থির থেকেই শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমকে জাগ্রত করতে হবে। অর্জুনকে ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করে ভক্ত হতে হয়নি, তেমনি গৃহস্থও তাঁর স্বধর্মে স্থির থেকেই শুদ্ধ ভক্ত হতে পারেন।

উপাখ্যানে উপদেশ

লুকিয়ে কলা খাওয়া

গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের বললেন পরমাত্মা সবার হৃদয়ে আছেন। তিনি সব কিছু দেখছেন।

পরদিন গুরুদেব চারজন শিষ্যকে দু'টি করে পাকা কলা দিয়েছিলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা মুহূর্তের মধ্যে এমন ভাবে লুকিয়ে কলা খেয়ে নাও যাতে কেউ দেখতে না পায়।"

প্রথম জন লুকিয়ে একটি ঘরের ভেতরে গেল। সেখানে একটি বেড়াল ছিল। বেড়ালকে তাড়িয়ে তারপর ঘরের কোণে লুকিয়ে কলা খেয়ে নিল।

দ্বিতীয় জন বাগানে ঢুকল। সেখানে গাছে কতগুলি পাখি দেখল। পাখিদের উড়িয়ে দিয়ে লুকিয়ে কলা খেয়ে নিল।

তৃতীয় জন রাস্তায় গিয়ে দেখল এক পথিক যাচ্ছে। সে চলে যাওয়ার পর লুকানো কলা খেয়ে নিল।

চতুর্থ জন কোথাও গেল না, কলাও খেল না। কলা দু'টি ধরেই থাকল।

তারপর গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা লুকিয়ে কলা খেয়েছ তো?"

একজন ছাড়া বাকি তিনজন মাথা নুইয়ে সম্মতি জানালো। কিন্তু যে শিষ্য কলা খেতে পারে নি, তাকে গুরুদেব প্রশ্ন করলেন, "তুমি কলা খাওনি কেন?"

সে উত্তর দিল, "গুরুদেব, আপনি এমনভাবে খেতে বলেছেন যাতে কেউ দেখতে বা জানতে না পারে। কিন্তু হৃদয়ে পরমাত্মা তো সব কিছুই দেখছেন, তাই আমি কলা খেতে পারি নি।"

তখন গুরুদেব সেই শিষ্যকে আশীর্বাদ করে বললেন, পরমাত্মাকে লুকিয়ে কোন কিছুই করা যায় না।"

হিতোপদেশ

জগতে সবাইকে ফাঁকি দেওয়া যায়, আমাদের সৎ অসৎ কর্ম জগতের লোক না প্রত্যক্ষ করতে পারে, কিন্তু সর্বসাক্ষী প্রত্যক্ষদর্শী ভগবান, যিনি আমাদের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে রয়েছেন তিনি সব কিছুই দেখছেন।

'শূয়োরের বাচ্চা'?

দোলোপাড়াতে দিন দিন কোন্দল লেগে থাকে। লালু বারবার কালুকে 'শূয়োরের বাচ্চা' বলে গালিগালাজ করছিল। কালু তাতে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। সে বার বার কালুকে ধমক দিয়ে বলতে লাগল, 'তুই আমাকে শূয়োরের বাচ্চা বলেছিস্। তোর গলা আমি কাটবই। তোর গলা না কাটা পর্যন্ত আমি থামবো না।' এই বলে একটা বড় দা হাতে নিয়ে লালুর দিকে তেড়ে গেল।

লালুর বোন দৈবাৎ এক সাধুকে দেখতো পেয়ে তাঁর কাছে মিনতি করলো, 'হে সাধুবাবা, আমার দাদাকে রক্ষা করো। তাকে এক্ষুনি কালু মেরে ফেলবে।'

সাধু তখন ঘটনা স্থলে এসে কালুকে দেখলেন, সে একটা দা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ঘর থেকে লালু বের হলেই সে কেটে ফেলবে। তার মুখ ক্রোধে লাল হয়ে আছে। সাধু বললেন, 'বাছাধন, তুমি কেন অনর্থক ক্রোধান্বিত হয়ে আছো। দয়া করে দা টা নিচের দিকে নামাও।' সাধুকে দেখে কালু দা নিচে নামাল।

কালু বললো, 'সাধুবাবা, এই লালু লোকটা খুব বদ আছে। সে আমাকে প্রতিদিনই শূয়োরের বাচ্চা বলে আসছে। তার পাল্টা জবাব আমি দিতে চাই।'

সাধু বললেন, যদি কারও শূয়োরের বাচ্চা বলার অভ্যাস থাকে সে বদ হলেও, তুমি কেন ক্রোধান্বিত হবে। তোমার তাতে ক্ষুব্ধ হওয়ার একবিন্দুও কারণ দেখি না। যে মানুষেরা শূয়োরের চেয়ে অধম তারাই কোন্দল করে মরে। যে মানুষেরা ভক্তি অনুশীলন করে তারা খুব ভালো। কেননা তারা বুঝতে পেরেছে যে শূয়োর রূপে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বরাহদেব। হ্যাঁ, তুমি এবং লালুও বরাহদেবের সন্তান। অতএব 'শূয়োরের বাচ্চা' এই কথাতে দোষ নেই। কিন্তু তোমাদের কোন্দলে বিশাল দোষ আছে।

এই কথা শুনে সব লোক হেসে উঠল। কালুর ক্রোধ দূর হলো।

হিতোপদেশ

মানুষ কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করলে তার ভাব, ভাষা, আচরণের মধ্যে এক মঙ্গলকর প্রীতিব্যঞ্জক উদ্দেশ্য ধরা পড়বে। অন্যথায় মানুষ উন্মাদনার বশে প্রতি পদে কোন্দল করে দুঃখ পাবে।

> যদি চাও প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গেরও সনে,
> ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে।

ছবিতে ছোটদের দশ অবতার

মোহিনী কলসটি গ্রহন করেছিল, তখন...

অসুরেরা তার কথা মত রাজি হলেন–

যখন দেবতারা এবং অসুররা একত্রিত হয়েছিল, মোহিনী তখন দেবতাদের অমৃত প্রদান করতে শুরু করলেন। অসুরেরা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন।

এদিকে মোহিনী দেবতাদের লাইনের শেষে চলে গেলেন, তিনি নিশ্চিত করলেন যে অমৃত নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে
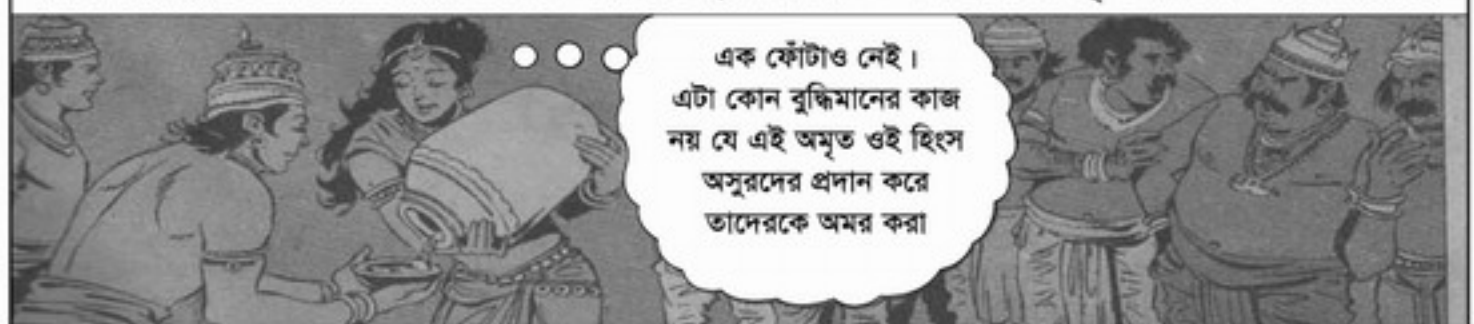
তখন সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হল, ভগবান বিষ্ণু তাদের সামনে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন।
এইতো বিষ্ণু আমরা প্রতারিত হয়েছি
কোথায় আমাদের অমৃতের ভাগ? অমৃত!!

কিন্তু বিষ্ণু শুধু হাসছিল....................

তখন গরুর পাখি এসে উপস্থিত হল।

ভগবান বিষ্ণু গরুর পাখির পিঠে চড়ে আকাশে উড়ে গেলেন।

রাগান্বিত অসুরের দেবতাদের প্রতি ক্ষিপ্র হলেন।
আমাদের সাথে প্রতারণা করেছ। বদমাস! আমাদের অমৃতের ভাগ দেওনি
র্বিত গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন
সমুদ্রের তীরে উড়ে এলো–
দেবতা ও অসুরেরা তার অনুসরণ করলো।
ভগবান বিষ্ণু আমাদের পাশে ছিল এর ফলে আমরা অমৃত পান করে অমর হয়েছি। এবার আস্ যুদ্ধ করতে।
ওদেরকে হত্যা কর

সেখানে অসুর ও দেবতাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে দেবতা পক্ষের অনেক সৈন্য নিহত হল কিন্তু অবশেষে অসুররা পরাজিত হল

ক্ষমা কর!

ক্ষমা কর!

পালাও!

পালাও!

তথাপি, ব্রহ্মা নারদ মুনিকে পাঠালেন.......................................

নারদ ব্রহ্মার সংবাদ নিয়ে দেবতাদের নিকট উপস্থিত হলেন।

তারপর ভগবান বিষ্ণু নিহত দেবতাদের জীবিত করলেন এবং অসুরদের হিংস্রতার জন্য শাস্তি দিলেন।

বরাহ অবতার

প্রলয়ের পর, নতুন কল্প শুরু হল। তখন ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্যের জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন।

প্রবল ঢেউয়ে ভূমিদেবী কাঁপছিল................................

.... সবকিছু সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল......................

আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

প্রশ্নঃ । আমি কৃষ্ণভজন না করে যদি দেশ সেবায় ব্রতী হই তবে আমার মৃত্যুর পর বহু কোটি লোক আমার আত্মার সদগতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করবে, তাতে আমার আত্মোন্নতি কি হবে না?

প্রশ্নকর্তা: শ্রী সুধীর দাস, ২৫ দয়াগঞ্জ জেলেপাড়া, ঢাকা।

উত্তর। প্রশ্নটিতে 'আত্মা' 'আত্মার সদগতি, 'আত্মান্নতি' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি আসলে কি? তা যদি আমরা না বুঝি তবে নিছক 'আমার আত্মার সদ্‌গতির জন্য বহু কোটি লোক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করবে, এই কথাটি পাগলের প্রলাপের মতো হয়ে দাঁড়ায়। 'আত্মা' হল পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য অংশস্বরূপ, মমৈবাংশো জীবলোকে (গীঃ ১৫/৭)। ভগবদ্‌ বিমুখ হওয়ার দোষে অর্থাৎ ভগবদ্‌ সেবার কথা কিন্তু সে মায়ারূপী জড় আনন্দভোগ করতে এই দুঃখময় জগতে অধঃপতিত হয়েছে-

কৃষ্ণ ভুলি সে-ই জীব অনাদি বর্হির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ (চৈঃ চঃ ম ২০/১১৭)

'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'এই কথা ভুলে। মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে॥ (প্রেমবিবর্ত)

কৃষ্ণ নিত্য, কৃষ্ণের সেবাও নিত্য, কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্পর্কও নিত্য। অংশকণা জীবের যথার্থ তাৎপর্য হচ্ছে পূর্ণ-পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। 'আত্মার সদ্‌গতি' বলতে বোঝায় ভগবানের পাদপদ্ম সেবায় উন্নীত হওয়া, নিত্য ভগবদ্ধামে ভগবদ সেবায় যুক্ত হয়ে নিত্যানন্দময় জীবন লাভ করা, তদ্ধাম পরমং মম (গীঃ ১৫/৬)। ভগবানের পাদপদ্মে ফিরে যাওয়াই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্মের একমাত্র সার্থকতা। কিন্তু 'কৃষ্ণভজন' ছাড়া 'আত্মার উন্নতি' অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর পরমনিয়ন্তা, তিনিই বলছেন এই জগত দুঃখময় 'দুঃখালয়ম্' (গীঃ ১৫/৬)। কৃষ্ণসেবা বিমুখ অর্থাৎ, কৃষ্ণবহির্মুখ জীবদের জন্যই জেলখানা রূপী জড় জগত তৈরী হয়েছে, অথচ আমরা এখানে বদ্ধ জীব হয়েও বাহাদুরী দেখিয়ে এই জগতের অন্য সমস্ত বদ্ধ জীবের চাল-ডাল-তেলঔষুধপাতি কাপড়-চোপড় বাসা-আশা দিয়ে তাদের সমস্যা সমাধান করতে চাইছি। যদিও বা আমি নিজেই সমস্যা-জর্জরিত। আমি নিজেই অপরের ক্ষুধা তৃষ্ণার সব সমাধান করে দেব বলে অনর্থক সংকল্প করি। প্রকৃতপক্ষে, আমরা কারও সমস্যার সমাধান করতে পারি না। যাকে ওষুধ দিচ্ছি সে পুনরায় অসুস্থ হচ্ছে; যাকে বাঁচিয়ে দিলাম বলে মনে করছি সে আমার সম্মুখেই মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে; যাকে অন্ন দিলাম সে পুনরায় ক্ষুধার্ত হয়ে চেঁচামেচি শুরু করছে; যার ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করে দিলাম, তার ঘর পুনরায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য বিচিত্র অভাব। অর্থাৎ, স্থায়ী সমাধান বলে এই জড় জগতে কিছুই নেই। শ্রীমদ্ভগবতে ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যে উল্লেখ রয়েছে-"মানুষ যখনই তার কৃষ্ণচেতনা হারিয়ে ফেলে এবং আত্ম-উপলব্ধির প্রতি তার আর আগ্রহ থাকে না, তখন পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া তার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণভাবনাবিহীন সমস্ত কার্যকলাপই জীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।" যখন আমার আত্মোন্নতির জন্য আমি কিছুই বুঝি না তখন কি করে আমি আশা করতে পারি যে, আমার মতো সমস্ত বদ্ধ জীব আমার নিজের আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে? প্রকৃতপক্ষে 'বহুকোটি লোক' তো দূরের কথা একজনও আমার মঙ্গলের জন্য ভগবানের কাছে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করবে কি না সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় তার প্রিয় স্ত্রী পুত্র যাদের জন্য সে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেছে, তারা মৃত্যুর দিনে তার কাছে বহু কান্নাকাটি করে বলতে শুরু করে- 'আমার জন্য কি রেখে গেলে, হায়। তুমি তো চলে গেলে, আমরা অত্যন্ত অসহায়. আমরা অত্যন্ত দুঃখী, আমরা তোমাকে ছাড়া কি করে থাকব?' এইভাবে তারা বুঝিয়ে দেয় সেই মৃত ব্যক্তির কাছে তাদের আরও দাবী রয়েছে। কিন্তু কোনও দাবী না মিটিয়ে সে কেন অসময়ে মারা গেল? তাই তারা কাঁদছে। অথচ, দেহত্যাগের পর সেই ব্যক্তি কোথায় কোন নরকে গিয়ে কত বছর ধরে যমদুতদের লাথি খাচ্ছে সেই ব্যাপারে সেই সব অত্যন্ত প্রিয় আত্মার-স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধবরা তার পরিণতির কথা কখনই চিন্তা করে না এবং কখনই তাকে দেখতেও পর্যন্ত যাবে না। অতএব কি করেই বা একজন ব্যক্তি সারা দেশের জনগনের কাছে নিজের আত্মাউন্নতির আশা করতে পারে? কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন-

সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

"তোমার সব রকমের মনগড়া ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। তা হলে আমিই তোমাকে তোমার সমস্ত কর্তব্য-অকর্তব্য জনিত পাপ থেকে উদ্ধার করব। এই সম্বন্ধে কোনও দুশ্চিন্তা করো না।"

পরিশেষে অব্যই উল্লেখযোগ্য এই যে, যদি আমরা অপরের মঙ্গল চাই, তবে তাদের হৃদয়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত দিয়ে তাদের জীবন গঠনের অনুপ্রেরণা দিতে হবে যাতে তারা এই অবশ্যম্ভাবী জড় দেহ ত্যাগের পর জন্ম-মৃত্যুর পরপারে নিত্য আনন্দময় ভগবদ্ধামে উন্নীত হতে পারে। এটিই বৈদিক তাৎপর্য। সর্বতোভাবে কৃষ্ণভজন করাই এই জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রশ্নঃ । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিরামিষ আহার্য গ্রহণ করতে বলেছেন। তা হলে চা-পাতা তো নিরামিষ এবং চা তৈরি করার উপকরণ দুধ, চিনি সবই নিরামিষ। তা হলে চা খাওয়া বর্জনীয় কেন?

প্রশ্নকর্তা: শ্রী রনজিৎ পোদ্দার, আগলা মাঝাপাড়া, আগলা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা- ১৩২৫।

উত্তরঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চা নৈবেদ্য হয় না। কারণ চায়ে মাদক উপাদান আছে, তাই ওটা খেলে সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা বোধ হয়। শুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবন গঠনে ঐসব মাদক দ্রব্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। চা পাতা, দোক্তা পাতা, তামাক পাতা, গাজা পাতা নিরামিষ হলেও মাদক দ্রব্য। মাদক ভক্ষণে শুচিতা নষ্ট হয়। মনের তামসিকতা বৃদ্ধি পায়। কেবল নিরামিষ হলেই যে, খাদ্যরূপে গ্রহণীয় হবে এমন নয়। ধুতরা পাতা আকন্দ পাতা, বিচুটি পাতা, বেড়াকলমী পাতা নিরামিষ হলেও বিষাক্ত। কেয়া পাতা নারকেল পাতা, খেজুর পাতা, তালপাতা নিরামিষ হলেও অখাদ্য। সেই জন্যই এসব পাতা খাওয়া বর্জনীয়।

প্রশ্নঃ। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করেছেন যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে। তা হলে শাক-সবজি আহার করলে কি নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করা হয়? এ বিষয়ে আপনারা কি বলেন?

প্রশ্নকর্তা: শ্রীমতি অনুরাধা দেবী দাসী, ১২৫ শাখাঁরী বাজার, ঢাকা- ১১০০।

উত্তর ঃ আমরা জগদীশ্বর পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশটাই প্রত্যক্ষ করতে চাই। লক্ষকোটি বছর আগে ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিরা কোনরকম যন্ত্রপাতি ছাড়াই নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে উদ্ভিদের প্রাণ আছে। শুধু তাই নয়, চুরাশি লক্ষ প্রকার জীবের মধ্যে উদ্ভিদ কুড়ি লক্ষ রকমের তাও শ্রীমদ্ভগবতে নির্দেশিত। অতএব তা শুধু সেদিনের একজন বিজ্ঞানীর কোন নতুন কিছু আবিষ্কার নয়। এই জগৎ পাপপূর্ণ। আমরা খাওয়াদাওয়ায়, চলাফেরায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে অসংখ্য জীব হত্যা করছি। জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে প্রচুর প্রাণী-বধ হচ্ছে। এতে অবশ্যই পাপ হচ্ছে এবং সেজন্য মানুষকে দুঃখভোগ করতেই হবে। ভগবানের আইনে কর্ম এবং কর্মফল পরস্পর অনুগামী। অন্যান্য জীবেরা অপর জীবদের বধ করলেও তাদের পাপ-পুণ্যের বিচার হয় না। ভগবদ্ নির্দেশিত বিধি একমাত্র মানুষের জন্য। এবার দেখা যাক্ কোন খাদ্য আমাদের গ্রহণ করা উচিত, কোন খাদ্য গ্রহণ করলে

আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার হবে না-সে সম্বন্ধে পরমনিয়ন্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কি বলেন-"আমাতে অর্পিত সমস্ত কর্মের শুভ-অশুভ প্রভাবযুক্ত সমস্ত বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত হতে পারবে এবং কর্মফলের প্রভাব তোমার উপর বর্তাবে না"-শুভাশুভ ফলেরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ (গীতা ৯/২৭)। আমাদের খাওয়াদাওয়ার বিষয়বস্তু ভগবানকে নিবেদন করে তারপর গ্রহণ করতে হবে। ভগবান বলেছেন-'তুমি যা কিছু আহার কর সে সমস্ত আমাকে অর্পণ করে গ্রহণ কর।" 'তৎ কুরুষ্ মদর্পণম্ (গীতা ৯/২৭)। অর্থাৎ বোঝা উচিত যে ভগবানের প্রসাদই কেবল গ্রহণ করতে হবে। তবে কলির প্রভাবে আজকের মানুষ মাছমাংসকে প্রিয় খাদ্য বলে মনে করছে। কিন্তু তা ভগবানকে নিবেদন করার নির্দেশ কোথাও দেওয়া হয়নি। বরং তার ভয়ংকর ফলভোগ কি করে জন্মজন্মান্তরে বর্তাবে তা শ্রীমদ্ভগবতে বর্ণিত হয়েছে। যারা পরম বিধাতাকে ভালবাসে তারা জানে কি কি বস্তু ভগবান পছন্দ করেন। তাই ভগবান উল্লেখ করেছেন-'আমার ভক্ত ফল, ফুল, শাকসবজি, জল আমাকে প্রীতিভরে যা দেয় তা আমি সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করি।"

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ (গীতা ৯/২৬)

পরম আরাধ্যদেবকে যে নিবেদন না করে ভোজ করে তার সম্পর্কে ভগবান নিজেই উলেখ্য করেছেন-'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপ যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ" অর্থাৎ, "তারা পাপই ভোজন করে যারা কেবল নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য খাদ্য তৈরি করে।" (গীতা ৩/১৩)

সুতরাং, যে দ্রব্য পরম ভোক্তাকে নিবেদিত হয়নি তা শুদ্ধ নয়। গৃহে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে এবং বাইরে অসুবিধাবশত মানসে ভোগ নিবেদন করে শুদ্ধ চিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করাই বিধি। একটি জাগতিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। রাজা বা সরকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যদি কোন সৈনিক বহুসংখ্যক মানুষকে মেরে ফেলে তবে তাকে কোন দণ্ডভোগ করতে হয় না বরং রাজা বা কর্তৃপক্ষ তাকে পদক পুরস্কৃত করতে পারেন। কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি কেউ নিজের সন্তানকেও খুন করে তবে তাকে আইনতঃ যাবজ্জীবন জেল অথবা ফাঁসি বরণ করতে হবে। ঠিক সেইরূপ ভগবদ নির্দেশিত আচরণে কোন দণ্ডভোগ করতে হয় না, বরং ভগবান তাঁর ভক্তকে আশীর্বাদ করেন যাতে এই দুঃখময় জগৎ থেকে চিরতরে উত্তীর্ণ হওয়ার যায়।

প্রশ্নঃ । বৈষ্ণবগণ নিরামিষ আহার করেন। কালী দুর্গা বৈষ্ণবী সেক্ষেত্রে পশুবলি দিয়ে কালি বা দুর্গার প্রসাদরূপে আমিষ খাওয়া হয় কী করে?

প্রশ্নকর্তা: শ্রী হৃষিকেশ রায়, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

উত্তর। বহু শাস্ত্রে উল্লেখ আছে দুর্গা কালী আদি সকল দেবদেবী ভগবানের দাস অর্থাৎ প্রত্যেকেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মা বলছেন-

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অর্থাৎ "প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনকারিণী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা; তিনি যাঁর ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৪) দেবীদুর্গাকে মহাদেব শিব বলেছেন, আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোঃ অর্থাৎ, সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। (পদ্মপুরাণ) শিব শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র গ্রন্থে প্রতিদিন কিভাবে শ্রীগোবিন্দের অর্চনা করতে হয়, তা দুর্গাদেবীকে নির্দেশ দিয়েছেন। শিব আমিষ ভক্ষণ করেন না। পতিপরায়ণা সতী দুর্গা শিবের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করেন। কালীও দুর্গারই প্রকাশ মাত্র। তাঁরা মাংসভূক বা রক্তপিশাচী নন। কলিযুগের ধর্মভ্রষ্ট, উগ্র ও পিশাচগুণসম্পন্ন মানুষেরা তাদের নিজেদের তামাসিকতার অনুকূলে উগ্র ও উলঙ্গ কালী-মুর্তির আরাধনা করে এবং মাংসলোলুপতা চরিতার্থ করতে পশুবলি দেয়। তারা কালি-দুর্গাকে বৈষ্ণবীরূপে দেখে না, তারা রক্তভায়ী মাংসপিশাচীরূপেই দেখে। এই হল কলির জীবের ভয়ংকর বৈষ্ণব-অপরাধ। কলিযুগে পশুবলি নিষিদ্ধ। অন্যান্য যুগে বৈদিক আচারসম্পন্ন শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে পশু আহুতি দিয়ে তৎক্ষণা মন্ত্রযোগে পশুর উন্নত নবজীবন দান করবার যথেষ্ট ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু কলিযুগে বৈদিক আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদের সে ক্ষমতা নেই। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেব জগতে পশুবলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সেই ইতিহাস সবার জানা।

মনুসংহিতায় 'মাংস' কথাটির অর্থ ব্যাখ্যাত হয়েছে 'মাম্ স খাদতি ইতি মাংস' অর্থাৎ সেও আমাকে এইভাবে খাবে যেরূপ আমি তাকে খাচ্ছি।" "বলি দিয়ে মাংস খাওয়া ধর্মানুমোদিত মনে করে যদি কেউ মাংসাশী হয়, তবে সে স্বধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মকেই স্বধর্ম মনে করে।" (ভাঃ ১১/৫/১৩ বিবৃতি)
"ধর্মজ্ঞানহীন সাধুত্ব-অভিমানী দুর্জন ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করলে পরলোকে সেই পশুরাই ঘাতকদের অনুরূপভাবে ভক্ষণ করে থাকে।" (ভাঃ ১১/৫/১৪) "আর যে সব দাম্ভিক ব্যক্তি ইহলোকে দম্ভ প্রকাশ করবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং সেই যজ্ঞে পশু বধ করে, পরলোকে তারা "বৈশস" নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যমদূতগণ তাদেরকে অশেষ যাতনা দিয়ে বধ করে।" (ভাঃ ১১/৫/২৫)

ছাগল-মহিষ-আদি বলি দিয়া পূজে॥
বৈশস-নরকে যাথে বধস্থান বলি।
নরক ভুঞ্জায়ে তারে তথা লৈঞা পেলি॥
ছাগ-মহিষের রূপ ধরি ভয়ঙ্কর।
খণ্ড খণ্ড করি তার কাটে কলেবর॥
আর্তনাদ করি কান্দে হইয়া ফাপর।
মহাশূলে তার অঙ্গ বিন্ধে নিরন্তর॥

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী ৫/৮/৪১-৪৪)

শ্রীমদ্ভাগবত (৫/২৬/৩১) শ্লোকে বলা হয়েছে-"যারা পশুবলি দিয়ে ভৈরব বা ভদ্রকালী প্রভৃতি দেবদিবীর পূজা করে , হিংসা-কবলিত সেই পশু যমালয়ে রাক্ষস হয়ে ঘাতকের মতো সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে তাদের বধ করে। ইহলোকে যারা পশুর রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্যগীত করে, সেই সব হিংস্রাশ্রিত পশু সেইরূপেই পরলোকে হিংসাকারীর রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্যগীত করতে থাকে।"

প্রশ্ন। আমরা জানি প্রত্যেকেই তার কর্মফল ভোগ করে। কেউ কারও পাপপুণ্যের ভাগী হয় না। কিন্তু অনেকে বলেন, বংশের একজন ভক্ত হলে অন্যেরাও উদ্ধার পেয়ে

যায়। এটা কি সম্ভব?

প্রশ্নকর্তা: শ্রী বিধান চন্দ্র দাশ, কুমিল্লা।

উত্তর । প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ পাপ-পূণ্য কর্মের ফল ভোগ করে। আবার, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রজাদের পাপের ভাগী রাজাকে হতে হয়, স্ত্রীর পাপের ভাগী স্বামীকে হতে হয়। পাপাচারীদের আচরণে দণ্ড দেওয়া থেকে যদি বিরত থাকা হয়, তবে আশ্রিতের পাপের ভাগী আশ্রয়দাতাকে হতেই হয়। সেই জন্যই দেখা যায় অনেক সময় ছেলে পাপাচার করলে তার পিতাকে জরিমানা দিতে হয়। যা হোক সেটি অন্য কথা। অবশ্য আমাদের নিজ কর্মফলেই আমরা সেই রকম প্রজাদি লোকজনের সংস্পর্শে জড়িত হই।

নানাবিধ পাপ ও পূণ্য কর্মফলে জীব বহু জন্ম ধরে এই জড় সংসারে আবদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু যখনই গুরু-কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার ফলে কেউ ভক্তিপূর্ণ জীবন গঠন করে, তখন তার বিগত দিনগুলির জাগতিক পাপপুণ্য প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। নির্দহতি চ ভক্তিভাজাং (ব্রহ্মসংহিতা)।

আবার, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমার ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তের সমস্ত পাপ আমিই স্খালন করি। সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি (গীতা ১৮/৬৫)। আমার ভক্তের সমস্ত অভাব অভিযোগ আমিই পূরণ করি। যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ (গীতা ৯/২২) ভক্ত যখন তাঁর পিতামাতাদি স্নেহশীল জনদের দুঃখের কথা চিন্তা করেন তখন ভক্তের সেই অভাবও পূরণ করেন। ধ্রুব মহারাজ যখন বিষ্ণুদূতদের কাছে, তার মা সুনীতির জন্য চিন্তা করছিলেন, তখন বিষ্ণুদূতেরা দেখিয়ে ছিলেন, 'ওই দেখ, তোমার মা তোমার সামনেই পুষ্পবিমানে বৈকুণ্ঠযাত্রী হয়েছেন।'

আর ভগবান নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদকে বলেন 'তোমার একুশ কুল উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে।' অর্থাৎ, ভক্তের জন্মকুলাদি তাদের কর্মচক্রে আবহমান কাল ধরে আর ভবসংসারে পড়ে থাকবে না। তারাও শুদ্ধ ভক্তের দৌলতে যতদূর সম্ভব শুদ্ধজীবনে– ভক্তিময় জীবনে ফিরে আসবার সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করে শুদ্ধভক্তের গতি প্রাপ্ত হবে। এমন নয় যে, একজন শুদ্ধ ভক্ত হল, আর তার বংশের সবাই অনাচারী থেকেও বৈকুণ্ঠে চলে যাবে,– নাম এমন নয়। তবে শুদ্ধভক্তের সেই বংশের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা থাকে যাতে তারাও শীঘ্রই অনাচারী জীবন থেকে মতিগতি পরিবর্তন করে শুদ্ধ ভক্তিচেতনায় উন্নীত হবে। আর সেই জন্যই ভগবান বলছেন–

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তা সমদর্শিনঃ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পুয়ন্তেহপি কীকটাঃ॥

'যেখানে যেখানে প্রশান্ত সমদর্শী সদাচারযুক্ত ও সমস্ত সদগুণে বিভূষিত আমার ভক্ত আছে, অত্যন্ত অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও সেই স্থানের এবং সেই বংশের মানুষেরা পবিত্র হয়ে যায়।' (ভাঃ ৭/১০/১৯)

১০। প্রশ্নঃ এই জগতে কি আধ্যাত্মিক, কি আধিদৈবিক, কি আধিভৌতিক সমস্ত দুঃখের মধ্যে আমরা জর্জরিত। আমাদের কর্মদোষে দুঃখলাভ করছি। সেই দুঃখ নিবৃত্তি কিভাবে সম্ভব হবে?

প্রশ্নকর্তা: শ্রী শয়ন দাস, বক্সনগর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তরঃ আমরা আমাদের কর্মদোষে দুঃখ লাভ করছি। তাই কর্মদোষ এড়িয়ে চললে দুঃখ নিবৃত্তি হবে। শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে বলছেন–

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মন্ তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥

"হে ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞদের দ্বারা নিরূপিত হয়েছে যে, ত্রিতাপ দুঃখ নিরাময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করা।" মানুষের সাংসারিক সমস্ত কর্ম যখন পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয় তখন সেই সমস্ত কর্ম ত্রিতাপযুক্ত সংসার বন্ধনের কারণ সমূলে বিনাশ করে থাকে।

১১। আত্মহত্যা করা কি পূর্বের কর্মফল ভোগ? না কি নতুন কর্ম? আত্মহত্যার পরিণতি কি?

প্রশ্নকর্তা: শ্রী রাম কানাই দাস, ভাঙ্গা, ফরিদপুর

উত্তরঃ যখন কেউ পূর্বকালে অন্যকে বেশী উদ্বিগ্ন করে থাকে, অন্যের জীবনের মর্যাদা নষ্ট করে থাকে, তখন কালান্তরে সে উদ্বেগ পেয়ে মতিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে পরিণামে জীবনের মর্যাদামূল্য নষ্ট করে দেয় আত্মহত্যার মাধ্যমে। এটি যদিও দেখতে নতুন কর্ম, কিন্তু এটা কর্মফলভোগ।

আত্মাকে হত্যা করা যায় না। কেবল অকালে নিজের দেহটাকে নষ্ট করা হল। তাই নতুন দেহ পেতে বিলম্ব হয়। বিদেহী আত্মাকে দেহধারী আত্মার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট ভুগতে হয়।

উত্তরদাতাঃ সনাতন গোপাল দাস

ধনি বিদ্বান কুলিনের বড় অভিমান,
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান।

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে, তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষের হৃদয় সবরকমের কলুষে পরিপূর্ণ এবং অন্য শ্রেণীর মানুষের হৃদয় অত্যন্ত নির্মল। কৃষ্ণভাবনার অমৃত-ভগবদ্ভক্তি, এই দুই শ্রেণীর লোকেরই হিত সাধন করে। যাদের হৃদয় কলুষে পরিপূর্ণ তারা কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে তাদের হৃদয়কে পবিত্র করতে পারে- তাদের হৃদয়ের আবর্জনা দুর করতে পারে। আর যাদের হৃদয় ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়ে আছে, তারা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে আর সকলকে কৃষ্ণভক্তি লাভ করার শিক্ষা দান করতে পারে। যারা মুর্খ, অথবা যাদের মনে কৃষ্ণভক্তির পূর্ণ প্রকাশ হয়নি, তারা অনেক সময় মনে করে যে সব রকমের কাজকর্ম পরিত্যাগ করে নির্জনে ভগবদ্ভজন করাটাই হচ্ছে পরমার্থ সাধন করার পন্থা। কিন্তু এই ধারণাটা ভ্রান্ত। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে অর্জুন যখন কর্ম পরিত্যাগ করে বনবাসী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তা থেকে নিরস্ত করেন। কৃষ্ণভক্তির ভান করে কর্ম-ত্যাগ করাটা। মূঢ়তা। যথার্থ কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার উদ্দেশ্যে সবরকম কর্ম করা। তাই ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কৃষ্ণভক্ত মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে। ভগবান ত্রি-কালজ্ঞ, তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত কথাই জানেন। তাঁর ভক্তরা, কখন, কিভাবে তাঁর সেবা করেছে সে কথা তিনি কখনও ভোলেন না। তাই তিনি সূর্য্যদেব বিবস্বানের উদাহরণ দিয়ে অর্জুনকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলেন। এই বিবস্বানকে বারো কোটি বছর আগে ভগবান নিজেই ভগবদ্গীতার তত্ত্ব-জ্ঞান দান করছিলেন। এই সমস্ত ভগবদ্ভক্ত মহাজনেরা সকলেই মুক্ত-পুরুষ এবং তাঁরা সকলেই সর্বক্ষণ ভগবানের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় রত। তাই তিনি অর্জুনকে উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের উপদেশ দিলেন যে-ভগবদ্ভক্ত মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবানের সেবায় কর্ম করাটাই হচ্ছে সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়।

পরম্পরা ধারায় ভগবদতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন এমন কোন মহাপুরুষকে গুরুরূপে বরণ করতে হয়। ভগবান নিজেই ভগবদতত্ত্বজ্ঞান সবপ্রথমে সুর্য্যদেব বিবস্বানকে দান করেন। সেই তত্ত্বজ্ঞান বিবস্বান তাঁর পুত্র মনুকে দান করেন, মনু তা তাঁর পুত্র ইক্ষাকুকে দান করেন। এ ভাবে সৃষ্টির আদি থেকে এই তত্ত্বজ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে। তাই গুরুশিষ্য পরম্পরায় পূর্বতন যে সমস্ত মহৎ আচার্যেরা রয়েছেন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এই জ্ঞান আহরণ করতে হয়। মানুষ যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন, গুরুপরম্পরার ধারায় এই জ্ঞান আহরণ না করলে সে কখনই এই তত্ত্বকেপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। সেইজন্যই ভগবান নিজে অর্জুনকে এই তত্ত্বজ্ঞান সরাসরিভাবে দান করলেন। অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যদি কেউ ভগবানের দেওয়া এই তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করে, তাহলে তিনি অনায়াসে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

জাগতিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে কখনই পরম-তত্ত্বকে উপলব্ধি করা যায় না। ভগবানই কেবল ধর্মের প্রণয়ন করতে পারেন। "ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রণীতম্।" জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে একটা মনগড়া ধর্ম তৈরি করলে তাকে ধর্ম বলে গ্রহণ করা যায় না। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, মনু, কুমার, কপিল, প্রহ্লাদ, ভীস্ম শুকদেব গোস্বামী, যমরাজ, জনক ইত্যাদি মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের ধর্মের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয় এবং তা অনুশীলন করতে হয়। কল্পনা এবং অনুমানের ভিত্তিতে আমরা আত্মোপলব্ধির পন্থা প্রণয়ন করতে পারি না, তাই তাঁর অহৈতুকী কৃপা বশবর্তী হয়ে ভগবান অর্জুনকে এই ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান দান করেছিলেন। সেই জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা এই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। কেউ যদি সত্যি-সত্যিই জড়জগতের বন্ধ থেকে মুক্ত হতে চায়, তবে তাকে কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। তাকে জানতে হবে ভগবৎ-তত্ত্ব কি, ভগবানের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক এবং এই জড়-জগতের বিভিন্ন গুণের প্রভাবে সে কিভাবে তার কর্ম করে। এই তত্ত্বোপলব্ধিই হচ্ছে আত্মা-উপলব্ধি। এই তত্ত্ব যে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে সে-ই বুঝতে পারে যে 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস' এবং ভগবানের দাসত্ব করাই হচ্ছে জীবের নিত্য-ধর্ম।

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় । শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥

তং ত্বেণকুণকং কৃপণং স্রোতসানূহ্যমানমভিবীক্ষ্যাপবিদ্ধং বন্ধুরিবা-
নুকম্পয়া রাজর্ষির্ভরত আদায় মৃতমাতরমিত্যাশ্রমপদমনয়ৎ ॥৭॥ ভাগবত: স্কন্ধ ৫,অধ্যায় ৮

অনুবাদ: রাজর্ষি ভরত নদীর তীরে বসে, সেই মাতৃহারা হরিণ-শিশুটিকে নদীর জলে ভেসে যেতে দেখলেন। তা দেখে তাঁর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হল। তিনি বন্ধুর মতো সেই মৃগ-শিশুটিকে স্রোত থেকে তুলে এনে, তাকে মাতৃহারা জেনে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন।